পরিণয়ে প্রগতি

(দ্বীতীয় খণ্ড)

১৯৩৭

পরিণয়ের প্রগতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীমতী শৈলসুতা দেবী প্রণীত

দেড় টাকা

প্রকাশক :—
কে, সি, আচার্য্য
২নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

যুবক লাইব্রেরী
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীহরিমোহন দে
গরব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১নং বালক দত্ত লেন, কলিকাতা

পাত্র পাত্রীগণ

পরিণয়ে প্রগতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বীণা রায় + নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগেব সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ একদিন তাঁহার কোন কোন সহ-অধ্যাপক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—**"আমি তো প্রফেসারী করি না, চৌকিদারী করি।"**

অধ্যাপক ঘোষ কথাটী কি অর্থে বলিয়াছিলেন, বলিবাব সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন ছিল না —আলোচনা চলিতেছিল সহ-শিক্ষা বা Coeducation বিষয়ে এবং সে আলোচনা সহ-শিক্ষার অনুকূল ছিলনা। সুতরাং অধ্যাপক ঘোষের উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্রোতাদের কাহারও কষ্ট হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়েব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশসমূহে ছাত্রীর সংখ্যা দিনে দিনে যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইতে না পারে, বিভাগীয় সেক্রেটারী যদি সেদিকে নজর না রাখেন তো রাখিবে কে?

অবৈধ প্রণয়ের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম। অধ্যয়ন-নিরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈধ প্রণয় বা পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হয়, ইহাও অধ্যাপকগণের—বিশেষতঃ বিভাগীয় কর্ত্তৃত্ব যাঁহার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে

তাঁহার আকাঙ্খিত বস্তু নহে। বিশ্ববিদ্যালয় ঘটক আফিস নহে—প্রণয়-দেবতা কাম-রতির নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া তাঁহারা প্রেমের কারবার ও খুলিয়া বসেন নাই। পড়াশুনার ঐকান্তিকতায় ব্যাঘাত জন্মিতে পারে যে-সকল কারণে তাহার কোনটীরই প্রতি তাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারেন না—ছাত্রছাত্রীদিগকে বৈধ অবৈধ যে কোন রকমের প্রেমচর্চ্চা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য। এই কারণেও হয়তো বিভাগীয় সেক্রেটারীকে চৌকিদারী করিতে হয়।

কিন্তু চৌকিদারীতে অধ্যাপক ঘোষ যে পটু নহেন, তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশেব অনেক ছাত্র-ছাত্রী যে নানাচর্চ্চা করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী বীণা রায় ছাত্র শ্রীযুত নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের সহ-শিক্ষার্থিনী হইতে সহধর্ম্মিনীতে উন্নিত হইতে পারিতেন কিনা কে জানে!

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্ যখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "মিলন-পূর্ণিমা"য় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েবই দুই ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মহল হইতে এই শ্রেণীব প্রণয় বর্ণনার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, 'দেশে তরুণ-তরুণীর মিলন-কেন্দ্র মাত্র দুইটী—বোলপুর শান্তিনিকেতন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ। শান্তিনিকেতনকে আশ্রয় করিয়া গল্প রচনা করিলে বিশ্বকবি গোঁসা করিবেন, আপনারাও যদি আপত্তি করেন তো আমরা গল্প-লেখকেরা দাঁড়াই কোথায়! ডাঃ নরেশচন্দ্র যদি তখন জানিতেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই দুইটী ছাত্র-ছাত্রী তাঁহার কল্পিত গল্পকে সত্যের রূপ দিতেছেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ কৈফিয়ৎ বলিতেন না।

কেবল ডাঃ নরেশচন্দ্রও নহেন, তাঁহার সুযোগ্য জামাতা অতি-আধুনিক "বেদে"র সৃক্ত-কর্ত্তা শ্রীযুত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও বীণা ও নৃপেন্দ্রের মধ্যে আপনার পরিকল্পিত কাহিনীকে রূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া সাফল্যের আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন এবং শনিবারের চিঠির শক্তিমান লেখক ৺রবীন্দ্র নাথ মৈত্রের কল্পিত গল্পের নায়কও বিশ্ববিত্যালয়ের সহাধ্যায়িনী ছাত্রের নিকট হইতে কদলীর খোসাপূর্ণ ঠোঙ্গার পরিবর্ত্তে অধিকতর সারবান বস্তুর দাবী করিয়া বসিত।

শ্রীমতী বীণার বয়স তেইশ কি চব্বিশ। বীণার পিতামহ পূর্ব্বে ছিলেন কায়স্থ; বীণার জন্মের পরে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে—ব্রাহ্মণতনয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই নিষিদ্ধ পশুমাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। এই জনপ্রবাদ স্বার্থক করিতেই বোধ করি নবীন ব্রাহ্ম পরিবার কন্যাকে অত বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়াছিলেন। যাহাহউক বীণা যথাক্রমে মেট্রিকুলেশন, ইণ্টার-মিডিয়েট ও বেচুলার অব্ আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া এম্-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হ'ন।

বীণার সহধ্যায়ী শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা জীবিত নাই—বিধবা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ আছেন। হিন্দুর ঘরের ছেলে তিনি—হিন্দুর আদর্শে তাঁহার জীবন গঠিত। বীণার সহিত প্রণয়-সঞ্চায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যাহা হউক, বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন।

এক অতি শুভক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বীণার সহিত নৃপেন্দ্রের চোখাচোখী হইল। সময়টা প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের উপযোগী

মধু মাস ছিল কিনা, সে মূহূর্ত্তটী মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল, কি শুক্তিগর্ভে মুক্তাসঞ্চারকারী স্বাতী-নক্ষত্র ছিল, পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করিবেন—আমরা তাহার ঠিকুজী রাখিতে পারি নাই। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের নূতন সেসন আরম্ভের সময় যাহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাঁহারা পাঁজি-লিখিত তিথি নক্ষত্রের উপরে আস্থাবান কিনা এবং আস্থাবান হইলেও এইরূপ মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ক্লাস আরম্ভের দিনক্ষণ নির্দ্ধারিত করেন কিনা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে আমরা সাবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। পাঁজি-লিখিত তিথি নক্ষত্রের যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতায় বীণা ও নৃপেন্দ্রের ন্যায় নব দম্পতি-যুগল রচনায় অসমর্থ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যবায়ভাগী হইতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাগবৎ শাস্ত্রী সর্ব্ববিধশাস্ত্রে পারদর্শি ও বিচক্ষণ; মনস্তত্ত্বে তাঁহার অত্যুচ্চ অধিকারের প্রশংসা ছাত্রীমহলেও শোনা যায়। তাঁহার উপর ভারার্পণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় উপরোক্ত বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা আছে।

পরিতাপ হইতেছে—যথার্থই আমাদের পরিতাপ হইতেছে—বীণা নৃপেন্দ্রের প্রথম প্রণয় সঞ্চারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আমরা সমর্থ হইলাম না। তখন ক্লাসে বাইরণের হ্যারল্ড কি সেক্‌সপীয়রের রোমিও জুলিয়েটের পাঠ গ্রহণ চলিতেছিল, হ্যারল্ডের নব নব প্রেমাভিজ্ঞতা কি রোমিও জুলিয়েটের গুপ্ত প্রণয় বর্ণনায় অধ্যাপকপ্রবর কতখানি উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শুনিয়া ছাত্রগণ তাঁহাদের সহাধ্যায়িনীগণের ঘর্ম্মসিক্ত লজ্জাবনত আনন-পানে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন কি না, তাহার রেকর্ড রাখিয়া যাইতে পারিলে যুগ-প্রগতির ইতিহাস অধিকতর সম্পূর্ণ হইত বুঝিতেছি।

'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'' সহ-শিক্ষা যখন সহ-বাসে পরিণত হইয়া বর্ণগন্ধসমাকুল বিচিত্র-পল্লবে পুষ্পায়িত ও ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবরেটরীতে যখন অন্যান্য বস্তুর Experiment (পরীক্ষা)র সঙ্গে সঙ্গে বিবাহেরও Experiment বা পরীক্ষা গ্রহণ চলিবে এবং Experiment বিফল অর্থাৎ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ বিছিন্ন হইলে সমুৎপন্ন ফল সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, সেদিনের সেই মহাপরিণতির ইতিহাস রচনার এই উপাদান অধিকতর বিস্তৃতভাবে সঞ্চয় করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত।

যাহা হৌক বীণা ও নৃপেন্দ্র যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, ইহাতে ভুল নাই। নৃপেন্দ্রের প্রাচীন সাহিত্যে—বিশেষ প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের অমর প্রেমকাব্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। নৃপেনের এক সহপাঠী নৃপেন ও বীণাকে ভাবে তন্ময় দেখিয়া চণ্ডী-দাসের একটি চিরস্মরণীয় কবিতা নৃপেনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—

"সই, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ্চ কুচমূলে হেম হার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি।"

নৃপেন্দ্রের মনে বাসনা জন্মিল—তিনি চণ্ডীদাসের অনুকরণে নূতন পদ রচনা করেন—কিন্তু পারিলেন না; তাঁহার সহপাঠি বন্ধু ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়া প্রেমিককে দেখাইলেন—

"সখা, ও ধনী কে কহ বটে।
আপ-টু-ডেট গোরী ফ্যসী কুমারী
বিশ্ববিদ্যার পাটে॥
অঙ্গের বসন অতি সংযমন
বাঁধিয়া রেখেছে বেণী।
আঁখি-যুগলে চশমাটি দোলে
খঞ্জন নয়ন জিনি॥"

আবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ছন্দ নৃপেনের আসেনা; তাই তিনি আর কাব্য রচনা করিতে পারিলেন না।

নৃপেন্দ্রের একান্ত দুঃখ—বীণারও সম্ভবতঃ তাই, তাঁহারা একই বিষয়ের হইলেও একই গ্রুপের ছাত্রছাত্রী নহেন। মাঝে মাঝে যে-সকল সাধারণ ক্লাস বসে, এই খেদ মিটাইবার জন্য তাঁহারা ঐসকল ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন। অন্যান্য ক্লাসের মত মেয়ে-ছাত্রীরা এখানেও অধ্যাপকের ডানদিকে কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। নিজের ক্লাসের মেয়েদের নিকটে বা দূরে যেদিন যেখানে খুসী বসিলেও নৃপেন্দ্র কিন্তু এখানে মেয়েদের সন্নিকটে বসিবার অভিলাস প্রদর্শনে বিরত হইয়া অনেকটা দূরেই বসিতেন। তবে তিনি এমন জায়গায় বসিতেন, যেখান হইতে বীণাকে বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। দূর হইতে নৃপেন্দ্র বীণার সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; বীণা কখনও নিবিষ্টচিত্তে অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন—কখনও একটানা নোট লিখিয়া যাইতেছেন—কখনও বা পেন্সিলের অগ্রভাগে অধরোষ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছেন এবং কখন গোলাপী গণ্ডের উপর হইতে লুব্ধ ভ্রমরতুল্য কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতেছেন, তাহার কোন মুহূর্ত্তটীই নৃপেন্দ্রের দৃষ্টির অগোচরে অতিবাহিত হইত না।

বীণাও তেমনি নৃপেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া সময় সময় বীণা এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া রহিতেন সত্য, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই টানা চোখদু'টীকে একবার নৃপেন্দ্রের দিকে ঘুরাইয়া লইতে অন্যথা করিতেন না। তাই নৃপেন্দ্র যখন দেখিতেন বীণা অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতেছেন, তখন বীণা হয়তো নৃপেন্দ্রের ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিতেছেন—নৃপেন্দ্র যখন নোট-লেখায় অতি-নিবিষ্ট, তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি-বিনিময়ে অসামর্থ্যের দরুণ মনে মনে দুঃখিত হইয়া উঠিতেন, তখন তিনি হয়তো নোটের খাতায় নোট লিখিবার পরিবর্ত্তে "It is not good to be too hurry (বেশী ব্যস্তবাগীশ হওয়া ভাল নয়)" "Do quietly what you do (যা কর র'য়ে স'য়ে)" কিংবা "Slow and steady wins the race (ধীরে সুস্থে না চল্‌লে বাজী জেতা যায় না)" প্রভৃতি প্রবাদবাক্যগুলি হস্তলিপির আদর্শে লিখিয়া যাইতেছেন। ফলে প্রতি তিন-চারি মিনিট অন্তর তাঁহাদের দৃষ্টি বিনিময় হইত, দৃষ্টিমাত্রই দু'জনে চোখ ফিরাইয়া লইতেন ; মুখ ফিরাইয়া অতিকষ্টে হাসি দমন করিতে পারিলেও অন্তরের পুলকের বহিঃপ্রকাশ চাপা রাখিতে পারিতেন না—দু'চারিজন ছাত্রছাত্রী লক্ষ্য করিতেন—বীণার গোলাপী গাল দু'টী আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে, নৃপেন্দ্র মাথা দোলাইয়া টেবিল বাজাইতে সুরু করিয়াছেন।

ইহা লইয়া ঐ ছাত্রছাত্রীরা নাকি অল্প-স্বল্প হাসি-ঠাট্টাও করিতেন, কিন্তু নৃপেন্দ্র কিংবা বীণা তাহাতে লজ্জিত হইতেন না, হইবেনই বা কেন ? প্রেমের মর্ম্ম যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে প্রেম যে এক স্বর্গীয় বস্তু। বিদ্যাধনের বর্ণনা দেওয়া হয়—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥"

কিন্তু প্রেম-ধন সম্বন্ধে বলা চলে—

"প্রেম-ধন যেই জন নিতে পারে কেড়ে।
দাসখৎ পরে' তবু নাহি যায় ছেড়ে॥"

সে-প্রেম কি অপরের হাসি-ঠাট্টায় দমিত হইবে?

আশুতোষ বিল্ডিংয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে বীণা ও নৃপেন্দ্রকে বড় একটা মিলিত হইতে দেখা যাইত না। তাঁহারা মিলিত হইতেন বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের বাহিরে—কলেজ ষ্ট্রীটের ওপাশে ফুটপাথে বাস্-ষ্ট্যাণ্ডের নিকটে। বোধ হয় যেদিন বীণা আগে বাহির হইতেন সেদিন তিনি নৃপেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেন, নৃপেন্দ্র আগে আসিলে বীণার প্রতীক্ষ্যা করিতেন। তারপর দুইজনে একত্র হইয়া কালীঘাটগামী বাসে উঠিতেন—কোন দিন বা এস্‌প্লানেডে, কোনদিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের কাছাকাছি নামিতেন। ইউনিভারসিটীর একটী ছাত্র আগে বাসে উঠিয়া একদিন নৃপেন্দ্রকে ডাকিলেন—"নৃপেন, আয় না!" নৃপেন্দ্র মুচকি হাসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—সে বাস্ চলিয়া গেল, পর পর আরও দু,চারিখানা বাস্ চলিয়া গেল, নৃপেন্দ্র বাস্‌ষ্ট্যাণ্ডেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় কোন সহাধ্যায়ীর সহিত দেখা হইলে নৃপেন্দ্র যেমন ডাকিতেন "এস না ভাই!" বীণাও তেমনি বেশ অপ্রতিভ ভাবেই আগন্তুককে ডাকিয়া বলিতেন—"আসুন না, একটু বেড়ানো যাক্।"

বলা বাহুল্য—সহাধ্যায়ীরা প্রলুব্ধ হইতেন না। তাঁহারাও তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র, পবিত্র প্রণয়ের মর্য্যাদা তাঁহাদের অনেকের নিকটেই অবজ্ঞাত নহে। সুতরাং তাঁহারা ইঁহাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা প্রদান না করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানাভিমুখেই চলিয়া যাইতেন। গড়ের মাঠে কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে

একা বীণার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে বীণার সহাধ্যায়িনীরা প্রশ্ন করিতেন —"একা যে ?"

বীণা হাসিয়া জবাব দিতেন—"একা নই ভাই, ঐ দ্যাখ···ঐ বেঞ্চিটায় বসে আছেন। আলাপ করবি ?" বীণার সহাধ্যায়িনীরা নৃপেন্দ্রেরও সহাধ্যায়িনী। তাঁহারা হয়তো হাসিয়া জবাব দিতেন—"না ভাই, এতদিন যখন আলাপের ফুরসুৎ হয়নি, তখন আরও কিছুদিন যাক্। বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করিস্—গিয়ে আলাপ করে আস্‌বো।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নৃপেন্দ্র হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন, অসবর্ণ বিবাহের হিন্দুবিরোধী বিশ্বাস বীণার সহিত প্রণয়ের পরেই তাঁহার অন্তরে স্থান লাভ করে। নৃপেন্দ্র এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের বাসায় অবস্থান করিতেন। অধ্যাপক সেন হিন্দু হইয়াও অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, নৃপেন্দ্র তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রায়শঃ অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখা যাইত। এই সকল আলোচনায় অসবর্ণ বিবাহের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দর্শন করিয়া অধ্যাপক সেন বোধ হয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। সুতরাং বীণার সহিত মিলনে নৃপেন্দ্রের তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোধ হয় প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়া উঠিল।

নৃপেন্দ্র একদিন বীণার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বীণা সম্মত হইলেন। নৃপেন্দ্র ইহাও জানাইলেন যে বীণাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিবেন না—এ কথার উত্তরে বীণা নাকি বলিয়াছিলেন যে, কোন কিছুতেই তাঁহার আপত্তি নাই ; তিনি কেবল নৃপেন্দ্রকেই চান, যে-কোন মতে হোক্ তাঁহাদের বৈধ-মিলন হইলেই হইল !

নৃপেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল হিন্দু-বিবাহ প্রথানুসারেই অসবর্ণ বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়। তাই তিনি বীণাকে লইয়া ভাটপাড়ায় এক পণ্ডিতের নিকটে উপনীত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় কি মত দিয়াছিলেন জানি না, তবে তিনি এবিবাহের প্রতিকূল হ'ন নাই ইহা নিশ্চিত। অগত্যা নৃপেন্দ্র "সিভিল ম্যারেজ এক্ট" অনুসারে বীণাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সিভিল আইন অনুসারে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নৃপেন্দ্রের কোন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে বিবাহের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বীণা ও নৃপেন্দ্র উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত—আপনার পায়ে দাঁড়াইবার মত, আপনাদের বিবাহ-ব্যবস্থা আপনারা করিয়া লইবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের হইয়াছে। যাহাহৌক পরস্পরের সহিত এই মিলনে তাঁহারা সুখী হইলেন—প্রণয়-দেবতার অব্যর্থ-সন্ধানে পীড়িত হইয়া যে দুইটী সুকোমল আত্মা প্রজাপতির দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল, বহু-আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় লাভ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইল।

বিবাহের পর নৃপেন্দ্র বীণাকে লইয়া পিতার জ্ঞাতি-খুল্লতাত রংপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গমন করেন। অসবর্ণ-বিবাহের ঘোরতর বিরোধী হইলেও রায় বাহাদুর এই নব-দম্পতিকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিতে ক্রটী করেন নাই। আহারাদিতে ঈষদ্ তারতম্য দেখা গেলেও সস্ত্রীক নৃপেন্দ্র সেখানে পর্য্যাপ্ত আদর-যত্ন লাভ করেন। আহারাদির তারতম্য নৃপেন্দ্রের অন্তরকে কিছু পীড়িত করিয়াছিল বটে কিন্তু বহু বাঞ্ছিতা বীণার জন্য তিনি তাহা সহিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন।

রায় বাহাদুরের আনুকূল্যে বীণা রংপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। নৃপেন্দ্রও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন হইল বীণাও রংপুরের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া কাশী গিয়াছেন; তিনি এখন কাশীর এক বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। কাশীতে তাঁহারা সুখে ও স্বচ্ছন্দেই কলাতিপাত করিতেছেন।

কাশীধামে অবস্থান করিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তাঁহারা বিস্মৃত হ'ন নাই—জীবনেও বোধকরি বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আহা, বিশ্ববিদ্যামন্দির তাঁহাদের নিকট যে মহাপ্রেমমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল—বিশ্ববিদ্যালয়েব ক্লাসে, বিশ্রাম-কক্ষে, উঠিবাব নামিবার সোপানে সোপানে, গোলদীঘির তীরবর্ত্তী সেই 'বাস্-ষ্ট্যাণ্ড'টীতে পর্য্যন্ত যে তাঁহাদের পরিপূর্ণ যৌবনের উদ্‌গত হৃদয়ের শত-সহস্র প্রেম-চিহ্ন বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয বৎসর বৎসর বহুছাত্র-ছাত্রীকে এম্, এ ডিগ্রী দিতে পারিবে, কিন্তু সিটি কলেজের কোন ছাত্রীর পবীক্ষা পাশ উপলক্ষে অধ্যাপক ও ছাত্রীতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর যে স্মরণীয় বিবাহটী হইয়া গিয়াছে, সেইটী ভিন্ন মিলন-বীণার এরূপ শ্রুতিসুখকর ধ্বনি সৃষ্টি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ!

বাঙ্গালার সখ্য বিবাহের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় শতকরা আশিটী ব্যর্থ হইতেছে। ইহা জানিয়াও যে সকল অপরিণামদর্শী যুবক সখ্যবিবাহের জন্য লালায়িত হয় ইহাই আশ্চর্য্য! ইহাদেরই কি পরিণাম ঘটিবে কে জানে?

লীলা বসু + জ্যোতিরিন্দ্র মুখার্জ্জী

বিশাল আকাশস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীর কোনটী কখনও কাহার উপরে সুপ্রসন্ন হয়, তাহার দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সূত্র আবিষ্কারে জ্যোতির্ব্বিদ-গণই সক্ষম। সাধারণ মানব আমরা কেবল ইহাই জানি যে, যে তরুণী বিদ্যার্জ্জনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, দেবী বীণাপাণির কৃপায় বয়সোচিত রূপ-যৌবন না থাকিলেও অনেকেই তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ন। বর্ত্তমান আখ্যায়িকার নায়িকা শ্রীমতী লীলাও এই শ্রেণীর তরুণীগণের অন্যতমা। দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ বিদ্যাচর্চ্চায় ইহাকে কোন অসুবিধায়ই পড়িতে হয় নাই—কেননা কোন মহানুভব ব্যক্তি আসিয়া মধ্যে পড়িয়া ইহার বাড়ীতে ও স্কুল কলেজে অধ্যয়ন সাহায্য করিয়াছেনই।

লীলা আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুর কন্যা। লীলার পিতা আলোক সন্ধানে বহির্গত হইয়া নিজেকে স্বীয় স্বজন ও সমাজ হইতে বহির্গত করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত পথে চলিবার মত আলোকের ব্যাটারী সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ফলে কন্যা লীলাকে পড়াইয়া শুনাইয়া মানুষ করিবার সময় যখন আসিয়া পড়িল, তখন তিনি কঠোর দারিদ্র্যভাবে প্রপীড়িত নিষ্পেষিত। একথা অস্বীকার করিলে আমা-দিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে—দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজ জীবনের আদর্শ তিনি বিস্মৃত হ'ন নাই, যে অদৃশ্য নক্ষত্রটী আপনার অমোঘ প্রভাবে একদিন তাঁহাকে আলোকের—অথবা আলোক-ভ্রমে আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত করিয়াছিল, শত লাঞ্ছনা সহস্র গঞ্জনা ভোগ করিয়াও

লীলাকে তিনি সেই অদৃশ্য-নক্ষত্র নির্দ্দেশিত পথে পরিচালিত করিতে সঙ্কল্পিত হইলেন। বস্তুতঃ কন্যার লেখাপড়ার জন্য তিনি যে কোনরূপ হীনতা স্বীকারে প্রস্তুত এবং এই কারণে তিনি এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কোন পিতা কোন কন্যার জন্য কোন দিন যাহা করে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই হিসাবে বাঙ্গলার নব-প্রগতির ইতিহাসে লীলার পিতা শ্রীযুত আনন্দ বসুর নাম অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিবে।

লীলার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় ঢাকায়। ঢাকারই এক বালিকা বিদ্যালয়ে দরিদ্রের সন্তান বলিয়া লীলা বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল স্কুলের পড়ায় চলে না—বাড়ীতে পড়াইবার জন্য গৃহ শিক্ষক আবশ্যক। স্কুলে অধ্যয়ন কালে শ্রীমান সুখেন্দু রায় নামক একটি বি-এ শ্রেণীর ছাত্র অধ্যয়নে অনুরাগ ও মেধা দর্শনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লীলাকে প্রাইভেট পড়াইত। লীলার পিতা যখন সুখেন্দুকে জানাইলেন যে তিনি দরিদ্র, প্রাইভেট পড়াইবার দরুণ তাহাকে কোনরূপ পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না, তখন সুখেন্দু সবিনয়ে বলিল—"আপনি পাগল হয়েছেন? আমি কি পারিশ্রমিকের লোভে লীলাকে পড়াইতেছি? লীলা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হোক্—তাহাতেই আমার শ্রম স্বার্থক হইল বিবেচনা করিব।" লীলার পিতা সরল প্রকৃতির মানুষ, তাহার উপর কন্যা স্নেহে তিনি অন্ধ। অনাত্মীয় সুখেন্দু কোন ভবিষ্যৎ সুখের আশায় তাঁহার কন্যাকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াইতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথবা বুঝিয়াও তিনি বুঝিলেন না—সুখেন্দুকে আসিতে নিষেধ করিলে যে লীলার পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। লীলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিল। লীলার পরীক্ষার পরে সুখেন্দু

অপরিচিত মফঃস্বলে যাইতে দ্বিধা করিলেন না, কন্যার অধ্যয়নেচ্ছা প্রবল দেখিয়া লীলার পিতাও ইহাতে আপত্তি করিলেন না—আপত্তি করিলে যে কন্যার বিদ্যাচর্চ্চার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। লীলার বয়স তখন উনিশ হইবে; উনবিংশতি বর্ষীয়া যুবতী কন্যা যে অনাত্মীয় বন্ধুর সহযোগিতায় কলেজের বিদ্যা ব্যতিরেকে অন্যবিধ বিদ্যায়ও পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে এবং বিদ্যার সহিত অবিদ্যাও সঞ্চয় করিয়া নিজ জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে, স্নেহান্ধ পিতার এই জ্ঞানটুকুও হইল না—ইহাই আশ্চর্য্য। ০অথবা ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই—আলেয়ার আলো যাহার চ'ক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে, সে যে সুস্পষ্ট দিবালোকেও পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথেই ঘুরিয়া মরিবে, ইঁহা যে তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম। যাহা হউক বন্ধুর সহিত কিছুদিন মফঃস্বলবাসের পর পিতৃ-বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে ও যত্নে লীলা কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া লীলা অপর এক কলেজে ভর্ত্তি হয় এবং সেখান হইতেই আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। লীলার পিতা-মাতাও এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। পিতা সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতেন বটে, তবে সংসারের অধিকাংশ খরচ—বিশেষতঃ লীলার পড়িবার খরচ পূর্ব্ববৎ সুহৃৎগণের সহায়তাই নির্ব্বাহ হইত। লীলার পিতামাতাকে এবিষয়ে ভাগ্যবান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে—কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পরে তাহারই সুকৃতির জোরে পিতামাতাকে বিশেষ অর্থকষ্টে ভুগিতে হয় নাই। বিশেষতঃ কন্যার পড়িবার খরচের জন্য কোনদিন তাঁহাদিগকে ভাবিতে হয় নাই।

লীলা যখন আই এ পড়িত, কয়েকটী যুবক প্রফেসর বিনা বেতনে তাহাকে বাড়ীতে আসিয়া পড়াইতেন। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এক

একজন স্বতন্ত্র প্রফেসর তো ছিলই, একই বিষয় অধ্যাপনের জন্য একাধিক প্রফেসরও লীলাদের বাড়ীতে আসিয়া জুটিতেন। লীলার সদাশিবতুল্য পিতা ইহাতে শঙ্কিত না হইয়া বরং গৌরবই বোধ করিতেন—তিনি ভিন্ন আর কাহার মেয়েকে পড়াইবার জন্য অধ্যাপকেরা দলে দলে আসিয়া বাড়ীতে ভীড় করিয়া থাকেন? লীলা যখন হাস্য পরিহাস ও সান্ধ্য-ভ্রমণে সঙ্গদান দ্বারা এই পরোপকারী নিঃস্বার্থপব অধ্যাপককুলকে পরিতুষ্ট কবিতেন, তখন তাহাতে বাধা প্রদানের আবশ্যকতা তাঁহারা উপলব্ধি কবিতেন না। আই-এ পরীক্ষাব পরে কয়েকমাস যখন লীলা বন্ধুগণের সহিত স্বেচ্ছা ভ্রমণ এমন কি কলিকাতাব বাহিরেও একক্রমে তিন চাবি বা ততোধিক দিবস যাপন করিতে লাগিলেন, তাহাতেও তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তাঁহাদেবও মনোগত ভাব এই যে, কন্যা যদি নিজ পছন্দ মত কোন অর্থশালী বব জুটাইতে পারে, তবে গরীব মা বাপেরও একটা সুবাহা হয। লীলার অনুগৃহীত যুবকগণেব মধ্যে অসচ্ছল অবস্থার কেহ না থাকে, কেবল একদিকে দৃষ্টি রাখিযা তাঁহারা আলোকপ্রাপ্ত পিতামাতার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় লীলার সংসারানভিজ্ঞা পিতামাতা কঠোর সত্যময় সংসারের এই সহজ বোধ্য তথ্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, এসংসারে ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া রঙ্গীন্ পাখা বিস্তার করিয়া বেড়াইবার মত প্রজাপতির অভাব নাই, অভাব কেবল দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবার মত—আপনার কৃতকর্ম্মের ফল আপনি ভুঞ্জিতে অগ্রসর হইবার মত পুরুষের। ইহাপেক্ষাও কঠোরতর সত্য বোধ করি এই যে, যে নারী পুরুষ-বন্ধুব বাহুবন্ধনে সহজেই ধরা দেয়, বহুনারী সঙ্গাভিজ্ঞ নারীচরিত্রে, বিশেষত পুরুষেরা তাহার বাহুবন্ধনকেই

সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল বলিয়া মনে করে। বহুজনবাঞ্ছিতা রমণীর দিকে পুরুষ সহজেই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বহুজনসেবিতা অনায়াসলব্ধাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লইবার মত আহাম্মক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ স্বৈরিনী নারীর সহিত স্বেচ্ছাবিহারে যাহারা অভ্যস্ত সেই উঞ্ছবৃত্তি সম্পন্ন পরমধুপিয়াসীরা বিবাহ-বন্ধনকে শৃঙ্খল-বন্ধন মনে করিয়া সযত্নে তাহা পরিহার করিয়া চলে।

এই অবস্থার মধ্যে লীলা বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। ছাত্রমহলে এখন তাহার যথেষ্ট নাম-ডাক, অধ্যাপক মহলেও খ্যাতি তাহার কম নহে। এ বারেও ছাত্রদল মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় তাহার চতুষ্পার্শ ঘিরিয়া রহিল না এবং কোন কোন অধ্যাপক শিঙ ভাঙ্গিয়া বাছুরে দলে প্রবেশ করতঃ সেই ভীর ঠেলিয়া তাহার বাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিলেন প্রাইভেট ভাবে তাহাকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত।

লীলার ছাত্রজীবন আজ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সহ-শিক্ষা ক্ষেত্রকে সহ-বিহার ক্ষেত্রে পরিণত করিবার লীলা যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিজের জীবনে সহ-বিহারের মহদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরাপর ছাত্রীদের দীক্ষিত করিবার জন্য লীলা কোন চেষ্টাতেই ত্রুটী রাখে নাই, তাহার সেই চেষ্টার ফল আজ ফলিয়াছে—সহ-শিক্ষা প্রভাবে সহ-বিহারও কলিকাতার একটী কলেজে অন্ততঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা সিটিকলেজের কথা বলিতেছি। সিটি-কলেজের কতিপয় ছাত্রছাত্রী কয়েকজন অধ্যাপক ও মেয়ে-হোষ্টেলের লেডী সুপারীণ্টেণ্ডেণ্টের সহযোগিতায় সর্ব্বজাতির মহামিলনকেন্দ্র ছুঁৎমার্গবর্জ্জিত পুরীধামে গিয়া সহ-বিহারের যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলে লীলার ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়া মহীয়সী নারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমোন্নতিসম্পন্ন প্রগতির

মহিমা ও মর্য্যাদা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিবার সময়ে সিটিকলেজের মহিমান্বিতা ছাত্রীরা যে পুরুষের সহিত ভ্রমণে অসম্মতা না হইয়া আপনাদেরই সহবিহারী ছাত্রগণের সহগমনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, এই সংবাদ শ্রবণে লীলা উল্লাসিত না হইয়া পারে নাই। পরে পুরীধামেও ছাত্রগণ সহ বাস করিয়া ছাত্রীরা একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার যে মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, এসংবাদ শ্রবণেও লীলা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছে। সমুদ্র স্নান করিতে যে ছাত্রীরা ছাত্রদেরসহ গমন করিতে ভুলে নাই, বরঞ্চ স্নানকালে ছাত্রগণের নানাবিধ সাহায্য গ্রহণ করিয়া নরনারীর অবাধ-মিলনের এক মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে "ছাত্রছাত্রী যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" এমন এক মধুচক্র রচনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে লীলার বুক যেন মহাগৌরবের অসহভারে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সংবাদ-পত্রে এই সকল বিররণ প্রকাশের পর বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত হওয়ায় লীলা প্রথম সবগুলি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পরে কতিপয় ছাত্রবন্ধুর বিবৃতি এবং সহ-বিহারে সহযাত্রী ছাত্র-হোষ্টেলের সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্টের নিজ স্বাক্ষরিত বিবৃতি হইতে সে উপরোক্ত বিবরণী-গুলি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তবে একটা বিষয়ে সে বড়ই ব্যথিত হইয়াছে—ছাত্রছাত্রীরা যে ফটো তুলিয়াছিল, কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্বে সেই ফটো নষ্ট করিয়া ফেলিবার কি প্রয়োজন ছিল! ফটোখানা যদি রাখিয়া দেওয়া হইত এবং কলিকাতায় আনিয়া এন্‌লার্জ করাইয়া উহা সিটি কলেজের কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইত, তবেই লীলা আরও খুসী হইতে পারিত। লীলার মতে ঐ ফটো রক্ষা করিলে এবং কলেজে কলেজে ও

বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে উহার বর্দ্ধিত প্রতিলিপি প্রকাশ্যভাবে রক্ষা করিলে সহ-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলরূপে পরিগণিত হইয়া উহা জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে প্রেরণা-সঞ্চারের বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণকারী ডায়নামোর কাজ করিতে পারিত। হায়! নিতান্ত পরিতাপের বিষয়—লীলা তখন কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে, নহিলে সে অবশ্য সহ-বিহার-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া বাংলার জাতীয় প্রগতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ঐ ফটোখানি রক্ষার ব্যবস্থা করিত।

বি, এ পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই লীলা এক অর্থশালী নবীন উকিলের প্রেমে পড়িল। প্রেমে পড়া লীলার জীবনে এই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে অনেক মৎস আসিয়া তাহার বঁড়শীর চাবিদিকে গুণ গুণ করিযাছে; কোনটী বা ফাৎনা নাড়িয়াই সরিয়া গিয়াছে, কোনটিকে সে খেলিয়া খেলিযা ছাড়িয়া দিযাছে। শিকারসমেত ছিপ্ উপরে টানিয়া আনিযা তাহাব যৌবন-মৎস্য-ব্যবসায়ে সে ইহার আগে আর তুলে নাই। উকীলটীব ছিল যেমন ব্যাঙ্কে বেশ মোটা অঙ্কের স্থায়ী জমানত, তেমনি হৃদয়-ভবা অগাধ প্রেম। নিষ্ঠাবান হিন্দুবংশের সন্তান তিনি স্বীয় পরিজনবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও লীলার বিবাহ-জালে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন—এমন কি "বিশুদ্ধ হিন্দুমতে" বিবাহের এক অভিনয়মঞ্চও নির্দ্দিষ্ট হইল।—

নির্দ্দিষ্ট হইল বটে, বিবাহরূপ মহৎ কর্ম্মটী সত্যসত্যই সম্পাদিত হইল না। তবে বিবাহের বৈধ অনুষ্ঠানটী ভিন্ন অন্যান্য "আনুসঙ্গিক"-গুলি বাদ পাড়িল না—উকীল-প্রবর কলিকাতায় এক বাড়ী ভাড়া করিলেন; বি-এ পরীক্ষা দিয়া লীলা সেই বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিল। যে নিরীহ প্রফেসারকুল বিনা-পারিশ্রমিকে লীলাকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়াইতেন, প্রতিদিন

সন্ধ্যা-ভ্রমণে তাহার সহযাত্রী হইয়া আপনাদের অমূল্য সময় তাহার জন্য অপব্যয় করিয়া পরার্থপরতার চরম নিদর্শন দেখাইতেন, এইবারে লীলার সন্নিকটে তাঁহাদের অবাধ গতিস্রোত প্রতিনিরুদ্ধ হইল। তাঁহারা ইহার প্রতিবিধানের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

উপায়ও যে আসিয়া না পড়িল এরূপ নহে। সত্য-মিথ্যা সঠিক বলিতে পারিব না, বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই লীলা সংবাদ পাইলেন যে গণিতশাস্ত্রে তিনি পাশ করিবার মত নম্বর পান নাই, কয়েকটী নম্বর খাকৃতি (short) আছে—ধর-পাকড় করিলে বাড়াইয়া লওয়া যাইতেও পারে। লেখাপড়া লীলার নিকটে চিরদিনই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু—বিশেষতঃ বি, এ ডিগ্রীলাভ তাহার কৈশোরের কামনা—অতি দীর্ঘ কুমারী-জীবনের সাধনা। লীলা ভাবিয়া আকুল হইলেন, আকুল হইয়া—"শধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া পূর্ব্বকথিত অধ্যাপককুলেরই শরণাপন্ন হইলেন। উকীল-প্রবর লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার ভাবী বধূ বঁধুগণের সহিত আবার জুটিয়া গিয়াছে। হাল ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাঁহার নীড় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র মুখার্জ্জী নামক তরুণ ডাক্তার পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে লীলা পরীক্ষায় পাশ হোক্ বা না হোক্, লীলাকে আপনার প্রেমময় অঙ্কে —আপনার গৃহিণী পদে সমাসীনা করিবার ব্যাপারে তিনি বেশ কৃতিত্বের সহিতই (with distinction) পাশ করিলেন। উকীলের বাড়ী হইতে আনিয়া লীলাকে লইয়া তিনি এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বর তাহাকে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

আয়োজন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গ্রীসের মহাকবি হোমর-

রচিত মহাকাব্যের নায়ক ইউলেসিসের পত্নী পেনিলোপির বিবাহার্থী যুবক-বন্ধুগণকে বিতাড়িত করিতে যতটা বেগ পাইতে হইয়াছিল, লীলার সেই পরম হিতৈষী প্রেমাকাঙ্খী অধ্যাপককুলের বিতাড়নরূপ দুরূহ কার্য্যে জ্যোতিরিন্দ্রের তাহাপেক্ষা কম বেগ পাইতে হইল না। নিজের উপস্থিতিতে লীলাকে উহাদের সহিত মিলিত হইতে দিলেন না, অনুপস্থিতিতেও যাহাতে মিলিত হইতে না পারে, তজ্জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা আবলম্বন করিলেন। অবশ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়াও যে লীলা অধ্যাপককুলের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করে, এতথ্য তাঁহার নিকটে গোপন রহিল না।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে লীলার বি-এ পাশের খবর জানা গেল। এতদিনের সাধনা ও ত্যাগ-স্বীকাব স্বার্থকতালাভ করিয়াছে দেখিয়া লীলা আনন্দিতা হইলেন—এইবারে তিনি বিবাহের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। এক পবিত্র-বাসরে "সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট" অনুসারে শ্রীযুত জ্যোতির্রিন্দ্র মুখার্জ্জীর সহিত শ্রীমতী লীলা বসুর বিবাহ হইয়া গেল।

লীলা কিন্তু এবিবাহে সুখী হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জ্যোতিবিন্দ্র প্রগতিপ্রাপ্ত নারীকে বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পত্নীর প্রগতি অধিকাংশ নারীর মত বিবাহ-বাসরে হোঁচট খাইয়াই থামিয়া পড়ে, ইহা তাঁহার আন্তরিক বাসনা। লীলার পূর্ব্বজীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে তিনি চক্ষের আড়াল হইতে দেন না। যে স্ত্রীকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারেন না, সে স্ত্রীর জীবনে সুখ কোথায়? লভম্যারেজ বা সখ্য বিবাহের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লীলা অনেকবার হাত-বদল হইয়াছে—পর পর পাঁচ সাতজনকে সে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারে নাই। অবশেষে যাহাকে সে ধরিয়াছে,

সেও একদিন মরীচিকায় মিলাইয়া যাইবে কিনা কে জানে? পাশ্চাত্যে আজকাল Experimental marriage বা পরীক্ষামূলক বিবাহের ধুয়া উঠিয়াছে, এই শ্রেণীর বিবাহ বা বিবাহাভিনয় যে কখনও প্রীতিকর পরিণাম আনয়ন করিতে পারে না, লীলার জীবনে তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়াও যাহাদের শিক্ষা না হইবে, তাহাদের আর বলিবার কিছু নাই।

চিত্রা দেবী + অসিত হালদার

ক্বচিৎ দু'এক ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম দেখা গেলেও সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া যায় যে শিল্পীরা কোমল হৃদয়। মানব-দেহের অতি সূক্ষ্ম অংশকেও বর্ণচ্ছটায় ও রেখাচ্ছন্দে সুন্দরতররূপে পরিস্ফুট করিতে গিয়া ইঁহারা যে মানব-চিত্তের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিতে আত্মহারা হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই গ্রন্থেরই প্রথম খণ্ডে কলিকাতা আর্ট স্কুলের স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুত মুকুল দে ও শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়ের পরিণয়-কাহিনী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখাইয়াছি—এক পতি-বিরহিণী বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের কৃচ্ছ্রসাধনায় বিগলিত-হৃদয় হইয়া শ্রীযুত দে তাহার পাণি গ্রহণকরতঃ কিরূপে তাহাকে সুকঠোর বৈধব্য-সাধন হইতে মুক্তিদান করেন। আর্ট স্কুলের শিল্প-সাধক ছাত্রগণের কাব্যহীন ধর্ম্মঘট যাঁহাকে একবিন্দুও টলাইতে পারে নাই, অমোঘ মহিমায় ছাত্রশাসনরূপে মহাকর্ত্তব্যের সাধন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শিল্পী-হৃদয় বিধবার বৈধব্য-ব্রতে বিগলিত না হইয়া পারে নাই।

এবারে আমরা আর একজন শিল্পীর করুণ হৃদয়ের মাধুর্য্য-মণ্ডিত কাহিনী ব্যক্ত করিব, যিনিও শ্রীযুত মুকুল দে'রই মিলনস্পর্শে মুকুলিত-হৃদয়া শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় অপর এক পতি-বিয়োগ-বিধুরা রমণীর শূন্যগৃহ পূর্ণ করিয়া তাহার খালি হাত দুটীতে শঙ্খবলয় এবং ভাগ্য-হত ললাটে সিন্দুর-লেখা পরাইয়া দিয়া বিরহ-সন্তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছেন। পুনঃপ্রণয়ের পর চিত্রশিল্পী অসিতকুমার নিজে

এই প্রেমময়ী নারীকে চিত্রা নামে সম্বোধন করিতেছেন, আমরাও বক্ষ্যমান আখ্যায়িকায় তাঁহার এই নামই ব্যবহার করিব।

অসিতকুমার শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র ও প্রিয়তম শিষ্য—"শান্তিনিকেতন স্কুল অব আর্ট" বলিলে যাহার অধিকতর পরিচয় দেওয়া হইবে, সেই ইণ্ডিয়ান্ আর্ট বা ভারতীয় চিত্রকলার একনিষ্ঠ সাধক। শিল্পী-জীবনে ও গার্হস্থ্য-জীবনে কলিকাতা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত মুকুল দের ইনি আদর্শ বন্ধু; বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল।

মহর্ষি (অসিত, দেবল কিংবা ব্যাস মনে করিবেন না) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ঋষি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিশ্বধর্ম্মের আদর্শ লাভ করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, শিল্পাচার্য্য (বিশ্বকর্ম্মা নহেন) অবনীন্দ্র-নাথের ঘূর্ণীয়মান "পল্লবীণী লতৈব" হস্তপদ, যক্ষ্মারোগীর ন্যায় অতি ক্ষীণ কটিদেশ ও বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির ন্যায় দেহাপেক্ষা ভারী স্তনের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্রকদলীর সাধনা করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাকাব ঈশ্বরেরই নিরাকার চরাণাশ্রয়ে আশ্রিত ব্রাহ্মধর্ম্মেব পূত-বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক আকার-গঞ্জন এনাটমী-বিহীন চিত্রের সাধনা করিয়া থাকেন। অসিতকুমারও ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বলালোকে অন্ধকার হইতে দূরে অপসৃতঃ হইয়াছেন এবং চতুরানন ব্রহ্মার পরিবর্ত্তে অদৃশ্যানন ব্রহ্ম-দেবতার পবিত্র-সাধনায় নিযুক্ত হইয়া সাধন-সঙ্গিনীরূপা এক প্রণয়লব্ধা ব্রাহ্ম-মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন।

নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনায় সাকার সাধন-পাত্রীর ন্যায় অসীম পত্নী-প্রেমকে সীমার মধ্যে নামাইয়া আনিতে একটী শ্যালিকার প্রয়োজন হয়, একথা বিবাহিত পুরুষমাত্রই স্বীকার করিবেন। হিন্দুর ঘরে এই

শ্যালিকা নবোঢ়া পত্নীর সহিত পতির মিলনে বিন্দেদূতীর কার্য্য করিয়া থাকেন—কারণ হিন্দুর লজ্জাবনতা নববধূ অতি প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়শঃ নিরাকার—যক্ষপ্রিয়া সমীপে যক্ষের বার্ত্তাবহনকারী মেঘদূতের ন্যায় এই সুদীর্ঘ বিরহকালে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি বার্ত্তা বহনের কার্য্যে শ্যালিকা-দূতী ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। নব-প্রেমিক ও নব-প্রেমিকার মিলন-দূতীর কাজ করে বলিয়া হিন্দুর জীবনে শ্যালিকার একটী মধুর ও সুচারু চিত্র অঙ্কিত হয়—বিবাহ-বাসরে কর্ম্ম-নিরতা ও পরিহাসোজ্জ্বলা মূর্ত্তিতে যাহার প্রথম দর্শন অবগুণ্ঠনবতী বধূ স্বামী-সঙ্গে যাত্রাকালে মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদে যাহার আত্মবিলোপ।

ব্রাহ্মের নিকটে শ্যালিকা কিন্তু বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। বিবাহার্থী ব্রাহ্ম-যুবক যখন তাহার ভাবীপত্নীর পিতৃ-পরিবারে প্রথম পরিচয় লাভ করে, পরিবারস্থ প্রত্যেকটী কুমারীকেই সে একচক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হয়। কোন্‌টি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে তাহার পত্নীত্বে রূপায়িত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় উদ্‌গত হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি সে হয় তো তাহাদের প্রত্যেককেই অর্পণ করে—প্রথম-প্রণয়ের সিগ্ধোজ্জ্বল চপলক্রীড়ায় অনেকেই হয় তো একটীবার করিয়া তাহার সঙ্গিনী হয়, শেষ পর্য্যন্ত যাহার সহিত তাহার প্রেম-বিনিময় টিকিয়া যায়, সেই হয় তাহার জীবন-সঙ্গিনী—শ্যালিকাকুল প্রণয-সঙ্গিনী হইয়াই দূরে অপসৃতঃ হয়। অপসৃতঃ হইলেও প্রথম-প্রণয়ের চিত্রটী একেবারেই বিলুপ্ত হয়, এমন কথা বলা চলে না। দুইপক্ষের না হোক—ব্যর্থ-প্রণয়ের বিদগ্ধ-বাসনার এতটুকু স্ফুরঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় একপক্ষের চিত্তমধ্যে কোথাও লুক্কায়িত থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব।

অসিতকুমারের শ্যালিকা চিত্রা এখন বিধবা। তাঁহার এই বৈধব্য

কেবল অসিতকুমারের স্ত্রীকেও যে পীড়িত করিত তাহা নহে, অসিতকুমারের শিল্পী-চিত্তও শ্যালিকার এই বৈধব্য-বেদনায় মুস্‌ড়াইয়া পড়িতে চাহিত। তিনি প্রায়শঃ স্ত্রীকে বিধবা শ্যালিকার পুনর্ব্বিবাহের জন্য তাগাদা দিতেন; স্ত্রী বলিতেন—দুইটি ছেলে যে ওর কোলে, সেইতো হয়েছে মুস্‌কিল; নইলে কি আর কথা ছিল?

পুত্রবতী বিধবা ব্রাহ্মিকাও যে পুনবায় পতিগ্রহণ করেন না, একথা বলিলে সত্যেব অঁপলাপ কবা হইবে। বরং পুত্রবতী ব্রহ্মিকার নিদর্শন অহরহঃ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পিতৃহীন শিশুগণের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন আত্মীয়গণ সাধারণতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিধবা ব্রাহ্মিকার নিঃসঙ্গ জীবনেব দুঃখদূর করিতে অগ্রসর হ'ন না; বিধবা যেখানে স্বয়ং আপনার দুঃখ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া ওঠেন, সাধারণতঃ সেক্ষেত্রেই তাহার অপরিহার্য্য পুনর্ব্বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে চিত্রা দেবীরও পুনর্ব্বিবাহ স্বতঃই সংঘটিত হইবে, এইরূপ ধাবণা করিয়াই বোধ হয় তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গ এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

সে অঘটন সংঘটনের শুভমুহূর্ত্ত যে শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, চিত্রা নিজেও তাহা মনে করিতে পারেন নাই। পিতৃহীন শিশুদ্বয়কে তিনি পরমযত্নে লালন-পালন কবিতেছিলেন, মনকে এই বলিয়া স্থস্থিব করিতেছিলেন যে, উহারা একদিন বড় হইয়া মানুষ হইয়া উঠিবে, উহাদিগকে বিবাহ দিয়া নূতন করিযা আমি সংসার পাতিব—আমার অতৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয় সেদিন উহাদেরই তৃপ্তি ও শান্তির মধ্যে স্থস্থির হইয়া উঠিবে।

কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে লুক্কায়িত ভোগস্পৃহা বাহিরের দুশ্চেষ্ট ও দুঃসাধ্য ত্যাগ-সাধনার ফলে বিলুপ্ত হয় না—হইতে পারে না। যে

নদী স্রোতবতী, বাঁধের আগলে আপাততঃ আবদ্ধ রহিলেও একদিন না একদিন যে মুক্তির উপায় খুঁজিয়া লইবেই—আপনার আবেগে প্রবাহিত হইয়া দুইকূল প্লাবিয়া চলিবেই।

অসিতকুমারের স্ত্রী একবার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সুদূর লক্ষ্ণৌএ তাঁহার শুশ্রূষা করে, অসিতকুমারের পাতান সংসার রক্ষা করে এমন কেহই নাই। অসিতকুমার আর্ট স্কুলের গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত। বাহিরের চিত্রসাধনায় ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিলেও সরকারী কার্য্যে অবহেলা করিতে পারেন না। তাহাছাড়া তিনি শিল্পী মানুষ, সংসারানভিজ্ঞতা তাঁহার পদে পদে। এমতাবস্থায় একজন কর্ম্মক্ষম স্ত্রীলোককে কর্ণধার করিয়া লইতে না পারিলে শিল্পী-গৃহিনী যেমন বিনা শুশ্রূষায় মারা যান, অসিতকুমারের সংসার-তরীও তেমনি দুস্তর সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোনদিন বা গভীর অদৃশ্যতায় তলাইয়া যায়। রোগ শয্যায় শায়িতা স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অসিতকুমার শ্যালিকা চিত্রাকেই আনাইয়া লইবেন স্থির করেন। যথা সময়ে চিত্রা আসিয়া লক্ষ্ণৌ-এ উপস্থিত হইলেন।

ভগ্নীপতির গৃহে আসিয়াই চিত্রা প্রথমে ভগ্নীর শুশ্রূষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলেন। ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিয়া, বিছানাপত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যসেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; তারপর বিশৃঙ্খল ঘর সংসারের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলতা আনয়ন করিলেন। পরিশেষে তিনি ভগ্নীপতির সুখ ও সাচ্ছন্দ্যবিধানে মনো-নিবেশ করিলেন!

শেষোক্ত কাজটী কিন্তু সহজ বলিয়া বোধ হইল না। অসিতকুমার শিল্প-সাধক, চিত্র-সাধনায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়—আহারাদি সাংসারিক কর্ত্তব্যের কথা আদৌ মনে থাকে না। চিত্রা

দেখিলেন, যদি প্রথমেই অর্ডিনান্স জারি করিয়া তাঁহার আহারবিহারাদি সংযমিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাহইলে অনর্থ ঘটিবে—একদিকে যেমন শিল্প-সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত জন্মিবে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় অসন্তুষ্ট করিয়া দিয়া আপনাকে তাঁহার বিরাগভাজন করিয়া তোলা হইবে। তাহা না করিয়া শিল্পীর মনের গতি বুঝিয়া তিলে তিলে তাঁহাকে আত্মসমাহিত করিবার চেষ্টা করা শ্রেয়। তাই প্রথমেই তিনি শিল্পীর বিশৃঙ্খল চিত্র-গৃহ (ষ্টুডিও) সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করিতে যত্নবতী হইলেন—যেখানে যে চিত্রটী মানায়, ঠিক সেখানে সেই চিত্র রাখিয়া দিলেন, তুলিগুলি পরিষ্কার করিলেন; শিল্পীর শিষ্যদের সাহায্যে নূতন কতকগুলি রঙ আনাইলেন এবং চিত্রগৃহের চারিপাশে কতকগুলি আধুনিক কলা-সম্মত ফুলদানীতে তাজা ও সুগন্ধী কুসুমের কতকগুলি স্তবক রাখিয়া দিলেন। শিল্পী যখন আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নূতন সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ না হইযা পারিলেন না। চিত্রাকে ডাকিয়া বলিলেন —কি সুন্দর তোমার রুচি (test)! তুমি যেন মূর্ত্তিমতী একখানি চিত্র! আমি অতঃপর তোমাকে চিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিব।

এইরূপে চিত্রার যত্নে ও সেবায় আসিতকুমারের চিত্ত পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিল। স্বামীর মুখে ভগ্নীর নিপুণতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া রোগশয্যাতেও পত্নীর মুখে হাসি ফুটিল। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন—আমি তো মরিতে বসিয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে সুখী দেখিয়া মরিতে পারিব, এই আমার সান্ত্বনা। বোনকে যদি কোনপ্রকারে ধরিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে তোমার এসুখ চিরস্থায়ী হইবে।

সত্যসত্যই শিল্পী-গৃহিণীর ব্যাধি আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা অতিক্রম

করিয়া গিয়াছিল। চিকিৎসকের আপ্রাণ চেষ্টা, ভগ্নীর ঐকান্তিক সেবা ও স্বামীর প্রেমোচ্ছ্বসিত শুভ-কামনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া এক পবিত্র মুহূর্ত্তে তিনি ইহলীলা সংবরণ করিলেন। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পদপ্রান্তে উপবিষ্টা সেবা-নিরতা ভগিনীর দিকে চাহিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে কেহ কহিল—আহা! কেহ বা সতী-সীমন্তিনীর নারী-জীবনের চরম সৌভাগ্য দর্শনে ধন্য ধন্য করিল। আত্মীয় ও অনাত্মীয় কেহই অসিতকুমারের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ভুলিল না।

[illegible] ও [illegible] সহানুভূতি ছাড়া আরও কিছু দিয়া যিনি শিল্প-সাধকের পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ে শান্তিদানে অগ্রসর হইলেন, তিনি চিত্রা। ভগ্নীর শোকে চিত্রা নিজেও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরার্থপর সেবাপরায়ণ হৃদয়ে আত্মসুখ অপেক্ষা অপরের সুখ-শান্তি সাধনের জন্য চিরদিনই উন্মুখ থাকিত! এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। কি সংসার-ব্যবস্থায়, কি আত্মসেবায় কোন দিক্ দিয়াই যাহাতে অসিতকুমার পত্নীর অভাব অনুভব করিতে না পারেন, সে দিকে চিত্রা তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন—কোনদিক্ দিয়াই পত্নী-বিয়োগজনিত শূন্যতা অসিতকুমারের চিত্তকে উদাসী করিয়া তুলিতে না পারেন, চিত্রা সেদিকে যত্নবতী হইলেন।

পত্নীর শোক অসিতকুমারের সুকোমল শিল্পী-হৃদয়ে বড় ব্যথা লইয়াই বাজিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিনকতক তিনি শিল্প-সাধনার মধ্যে আত্মসমাধিলাভপূর্ব্বক পত্নী-বিয়োগ-ব্যথা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মরুভূমির বালুকা-সমুদ্রে পুষ্পিত কাননের সৃষ্টি যেমন অসম্ভব, শূন্য হৃদয় লইয়া সুন্দরের সাধনাও তেমনি অসম্ভব।

অসিতকুমার কিছুতেই ব্যাথিত চিত্তকে শিল্প-সাধনায় সমাহিত করিতে পারিলেন না।

ভগ্নীপতির উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের এই গোপন পরিচয়টুকু চিত্রার অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি সংসার-কার্য্য হইতে যতদুব সম্ভব নিজকে অবসর দিয়া অসিতকুমারের চিত্তবিনোদার্থ তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে চেষ্টা করিতেন ; নানাপ্রকারে রহস্যালাপ দিয়া, হাসি দিয়া, গল্প দিয়া, গান দিয়া সর্ব্বদাই তিনি অসিতকুমারের ব্যাথিত চিত্তখানি নূতন নূতন রসস্রোতে উৎফুল্ল রাখিতে প্রয়াস পাইতেন।

পরিহাসনিপুণা শ্যালিকার এইরূপ অবিশ্রান্ত রহস্যালাপে অসিত-কুমারের দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না। অনাস্বাদিতপূর্ব নূতন আনন্দে কখন যে তাঁহার মধ্যকার শিল্পীটী পুনরায় জাগরুক হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই টের পাইলেন না। এই সময়ে চিত্রবিদ্যায় তাঁহার হাত এত খুলিয়া গেল যে তাঁহার অঙ্কিত নূতন নূতন চিত্রদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ছাত্রগণ পর্য্যন্ত বলাবলি করিতে লাগিল—বাঃ! এত বর্ণ-বৈচিত্র তো ওঁর চিত্রে আর কখনও দেখা যায় না। বস্তুতঃ অসিতকুমারের অঙ্কিত চিত্রগুলি এতদিন যেখানে ছিল ভাব-প্রধাম, এখন সেখানে তাহা বর্ণ-বৈচিত্র্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার একখানি চিত্র বর্ণানুরঞ্জনে এত মনোহারিতা লাভ করিযাছিল যে শিল্পী নিজেই উহা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিত্রাকে ঐ ছবিখানি দেখাইয়া তিনি বলিলেন যে, চিত্রা যদি তাঁহার চিত্তখানি সরস করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ চিত্র অঙ্কণে তিনি কদাপি সক্ষম হইতেন না। হাসিয়া চিত্রা বলিতেন—তাহ'লে আমাকে তোমার পুরস্কৃত করতে হবে গো! অজিতকুমার হয়তো উত্তরে বলিতেন—পুরস্কার তো তুমি রোজই পাচ্ছ চিত্রা। চিত্রাকে যে অসিতকুমারের ঘর-সংসারের

সমুদয় কার্য্য দেখিতে হইত, তিনি হয়তো বা তাহারই কথা উল্লেখ করিয়া একথা বলিয়া থাকিবেন!

চিত্রার দুইটী শিশুপুত্র এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিল বলিয়াছি। এদিকে ব্যস্ত থাকায় চিত্রা তাহাদের প্রতি পর্য্যাপ্ত যত্ন লইতে পারিতেন না। যত্নের অভাবটুকু অজিত কুমারই পূরণ করিয়া দিতেন—সময়ে অসময়ে উহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া, উহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদে রত থাকিতেন। এক এক সময়ে হয়তো তিনি চিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিতেন—তোমায় যদি আরও দু'একটী সন্তান থাকৃত চিত্রা, তাহ'লে আমার শূন্য গৃহখানি আরও কলহাস্যধ্বনিতে মুখরিত [illegible] রাখিতে পারিত। শুনিয়া চিত্রা বাহিরে লজ্জার ভাব দেখাইলেও অন্তরে অন্তরে হয়ত অবশ্যই খুসী হইয়া উঠিতেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগ্নী গৃহে থাকি তিনি কেবল আনন্দদান করেন নাই, মার্জ্জিত-রুচি ও সুকোমলহৃদয় তাঁহার সংসর্গে নিজেও যেন নিজ জীবনের বিস্মৃত-প্রায় বিনষ্ট আনন্দের দিনগুলি ফিরিয়া পাইতে ছিলেন।

কিন্তু হায় এ সংসারে বিনাশ্রমে বিনামাশুলে কেহ আনন্দরূপ অমূল্য পদার্থ লাভ করিতে পারে না। আনন্দ অর্জ্জনের জন্য মানুষের যথেষ্ট শ্রম করিতে হয়, কষ্টের মাশুল দিয়া আনন্দের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

অসিতকুমারের ঐকান্তিক সেবা ও সংসার পরিচালনা-জনিত ক্লান্তিতে চিত্রার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—নিজকে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করিলেন। তাঁহাকে দিনে দিনে অসুস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়া অসিতকুমার উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন—এতদিন সেবা নিয়েছ, এইবারে তাহার মূল্য দাও।

অসিতকুমার সেই শ্রেণীর লোক নহেন, বস্তুত উদার হৃদয় অসিত-কুমার নীচতার পরিচয় প্রদান করিলেন না; অসুস্থ শ্যালিকাকে শ্বশুরা-লয়ে না পাঠাইয়া নিজেই তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন।—চিত্রা তাঁহার আনন্দ সঙ্গিনী ছিল; বিবাহ-বাসরে নিরাকারধ্যানমগ্ন আচার্য্যের মুখনিসৃতঃ প্রার্থনাবাণী শ্রবণের পরে "চিত্রা দেবী, আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইলাম" বলিয়া অসিতকুমার প্রিয়া হইতেও প্রিয়তমা শ্যালিকাকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া লইলেন। বহু দিবস পরে বহু বিস্মৃত ও অবিস্মৃত বিরহ রজনীর অমানিশান্তরালে স্নিগ্ধশুভ্র চন্দ্রালোক মণ্ডিত চন্দ্রাতপ-তলে নববধূ-বেশে সালঙ্কারা ও সাভরণা চিত্রাও মুগ্ধচিত্তে বলিলেন—'অসিতকুমার, আমার জীবণের এই নবপ্রভাতে আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নবজীবন সঙ্গী করিয়া লইলাম।'

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার একটী করুণ মধুর মিলনদৃশ্যের সহিত এই দৃশ্যটীর একমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি হইল যে নারী কম্পিত ওষ্ঠে বর-বধূ মিলনে শঙ্খধ্বনি করিতেছিল, আজ সেই বধূর আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত লাভের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে আর সে দিনকার লজ্জাবনতা নববধূটী কোন অদৃশ্য লোকে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দর্শনে হাসিতেছে কিংবা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে কে জানে? হয়ত বা সে অদৃশ্যলোকবাসিনীর নিকটে দাঁড়াইয়া এক অদৃশ্যলোকবাসী হতভাগ্যও এই অভিনব অপ্রার্থিত মিলনদৃশ্য দর্শন করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে মিলন সভার অদূরে কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান দু'টী অযত্ন বৰ্দ্ধিত শিশুর ম্লান মুখপানে চাহিয়া বিষাদ বেদনায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। দৃশ্যলোকে ও অদৃশ্যলোকে—ইহলোকে ও পরলোকে যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে হে বিশ্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করিয়া এই কর যে, ঐ

অদৃশ্যলোকবাসী ও অদৃশ্যলোকবাসিনীর নয়ন-বিগলিত অশ্রুধারার একটী বিন্দুও যেন নব-সুখ নব-স্বপ্নে বিভোর পুলকাবেগে উদ্বেলিতহৃদয় ইহলোকবাসী ও ইহলোকবাসিনী এই নর-নারী-যুগ্মের উপরে বর্ষিত হইয়া ইহাদেব ,নব-তরঙ্গে নব-স্রোতে প্রবাহিত সুখ-তটিনীটীকে তোমার নিমিষের অনবধানতায় নিঃসঙ্গ কবিয়া না দেয়। অতীত আজ অতীত-গর্ভে সমাধিলাভ করুক, অসিত-চিত্রার বর্ত্তমান জীবন সান্ত্বনাময়, ভাবী-জীবন সুখময় হইয়া উঠুক।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্। শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

মঞ্জুলা বসু—এ, কে, বসু

"নহ শ্বশ্রু, শ্যালা-বধূ, বধূ মোর নহ গো বালিকা,
হে শ্বশুর-নন্দিনী শ্যালিকা।
রাত্রি যবে দীর্ঘতর উৎকণ্ঠিত শয্যাশায়ী আমি
তুমি থাম দ্বারপ্রান্তে ভগিণীরে তব সঙ্গে আনি,
চঞ্চল চপল পদে স্ফীতবক্ষে মুগ্ধ নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে পৌছাইয়া সঙ্গিনীরে বাসর-শয্যাতে
বহ আড়ি পেতে।
বাহিরে প্রতীক্ষমান বহ সচকিতা
শ্যালী, অকুণ্ঠিতা॥

তুমি যেন আমাদের মিলনের মোহন-মালিকা
অৰ্দ্ধস্ফুট-কুসুম শ্যালিকা।
মোদের বিবাহরাত্রে ফুটেছিল চারুমূর্ত্তি ধরে'
ডানহাতে ঘটখানি, বরণডালাটী বাম করে,
উৎসবের ধুমাধুম বাদ্যকোলাহলে অবিরত
হেরেছিনু করাঙ্গুলে বরণের ছন্দে রূপায়িত
দেহ হিন্দোলিত।
ঘৰ্ম্মসিক্ত ক্লান্তক্লান্তি জামাতৃ-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা॥

কোনোকালে হবে না কি মুকুলিতা যুবক-ভর্ত্তৃকা,
রবে চিরকিশোরী শ্যালিকা ?
ঘোমটা মাথার পরে কার ঘরে বসি কোন বেলা
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি করিবে গো যৌবনের খেলা,
রুদ্ধ-বাতায়ন কক্ষে কার বক্ষে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে
স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যমুখে পড়িবে ঢলিয়া মুগ্ধচিতে
কার অঙ্কটীতে।
যেদিন জানিবে নিজে যৌবনে গঠিতা
নারী প্রস্ফুটিতা॥

ভদ্রনারীনৃত্যাসরে নৃত্য যবে করিবে কালিকা
আজিকার চপলা বালিকা।
তব নৃত্যচ্ছন্দে মাতি উঠিবেক' যুবকের দল,
বক্ষ হ'তে থাকি থাকি সবে যাবে চঞ্চল অঞ্চল,
কাচলির চারুশোভা হেরি মুগ্ধ হইবেক' তারা,
বহুমূল্য টিকিটের অপব্যয় ভূলি আত্মহারা
ভট্টি-মাড়বারা।
সহসা ওড়্না যাবে টুটে আচম্বিত
রবে অসম্বৃতে॥

হবে যুগ-প্রগতির যুগে যুগে তুমি হে পালিকা
হে জামাতৃ-মোহিনী শ্যালিকা।
হেজুযার জলে যবে ধৌত হবে তনুর তনিমা,
দর্শকের বক্ষ মাঝে চঞ্চলিয়া বহিবে শোণিমা,
অতি-তুচ্ছ কষ্ট্যুমের সাধ্য কিগো যৌবন-জোয়ার
রুদ্ধ রাখে বিমুখিয়া দর্শকের শত-বাসনার
আঁখি দুর্ণিবার।
যুবক-মানস-স্বর্গ হেজুযা-রঙ্গিনী
অয়ি সন্তরিণী॥

কলেজে পড়িবে যবে, কটাক্ষেতে বিঁধিবে শায়িকা
যুব-জন-হৃদয়ে শ্যালিকা।
ছাত্রগণ পড়া ছাড়ি ডালি দিবে পরীক্ষার ফল,
তোমার কটাক্ষপাতে প্রফেসার হইবে চঞ্চল,
শাড়ীর নট্‌কান-গন্ধ হিন্দোলিয়া বহি চারিভিতে
মধুমত্ত ভৃঙ্গদল মোহিয়া ফিরিবে লুব্ধ চিতে
তব সঙ্গ নিতে।
বিদ্যুৎ সঞ্চারি' যাবে আকুল অঞ্চলে
বেণী-সুচঞ্চলে॥

সেইদিন থাকিবেনা শুধু জড় মিলন মালিকা
হে ভবিষ্য-যৌবনা শ্যালিকা।
আদিযুগ আদমের এজগতে ফিরিবেনা আর
সুবসনে 'ইভ' করে তার সনে মোটর-বিহার,
তোমারে লইয়া যাব সিনেমায় প্রতি সন্ধ্যারাতে
লভিবে নূতন-শিক্ষা হলিউড-বাসিনী সাক্ষাতে
লুব্ধ আঁখিপাতে।
অন্তরে সঞ্চিত কোবো প্রেমের প্রেরণা
ভায়বা-অঙ্গনা॥

ভাবিওনা ভাবিওনা, একদিন হবে সাবালিকা
পেয়সীর সোদরা শ্যালিকা।
সেই আশা লয়ে আজি যৌবনের করি অপচয়
একদিকে ক্ষয় যাহা, জানি অন্যদিকেতে সঞ্চয়,
একজন অবিশ্রান্ত প্রসবেতে ক্লান্ত যবে, বাসি—
অপরা যৌবন স্পর্শে উঠিবেক উচ্ছসি' উদ্ভাসি'
প্রণয়-পিয়াসী।
সব আসা পূর্ণ হবে সেইদিন প্রাণের স্পন্দনে
বাহুর বন্ধনে॥"

মনে পড়িতেছে, যেন কোন এক সামায়িক-পত্রে শ্যালিকাবন্দনার উপরোক্ত উচ্ছ্বাসময় কবিতাটী পাঠ করিয়াছিলাম। কবিতাটী বোধ করি কোন অতি আধুনিক সাহিত্যিকের রচনা, যৌনতত্ত্বান্বেষী অতি আধুনিক সাহিত্যিক ভিন্ন আর কে আপন শ্যালিকার প্রতি এরূপ লুব্ধ

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন ? কে আপন শ্যালিকাকে কলেজে নিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণের সহিত প্রেম করিতে শিখাইবেন—ভদ্র-নারীনৃত্যের দলে ভর্ত্তি করিয়া ভাটিয়া-মাড়োয়ারীর বাসনা-উদ্রেক করাইতে চেষ্টিত হইবেন—হেদুয়ায় সাঁতার কাটাইয়া শত-সহস্র কাম-পিপাসুর লুব্ধদৃষ্টির খোরাক জোগাইবেন!

শ্যালিকা স্ত্রীর ভগ্নী, সহধর্ম্মিণীর অনুজা। স্থির-বুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রই শ্যালিকাকে সহোদরা তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সৌভ্রাত্র্য-সঙ্গত স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন—সভ্য সমাজের ইহাই দাবী! সমাজ-রক্ষকগণের ইহাই নির্দ্দেশ। অবশ্য এই নির্দ্দেশ যে কেহই লঙ্ঘন করে না, এই দাবী যে সকলেই নির্ব্বিরোধে মানিয়া চলে, এরূপ নহে। আমরা এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখাইয়াছি যে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল্ বঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার তাঁহার বিধবা শ্যালিকাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দাম্পত্য—তথা যৌন-জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় আমরা এক সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ভদ্রমহিলার কথা উল্লেখ করিব, যিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত প্রেমচর্চ্চার অভিযোগ আনয়ন করিয়া এক তরফা ডিক্রী পাইয়াছিলেন।

এই মহিলার নাম শ্রীযুক্তা মঞ্জুলা বসু। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারীষ্টার মিঃ এ কে বসুর (শ্রীযুত অসীমকৃষ্ণ বসুর) বিবাহিতা পত্নী ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মিঃ বসুর কেবল কলিকাতা হাইকোর্টেই নহে, সমগ্র কলিকাতা মহানগরীতেই বিপুল প্রতিষ্ঠা, অগাধ প্রতিপত্তি। হাইকোর্টে তাঁহার পত্নীর আনীত ব্যাভিচার ও পত্নী নির্য্যাতনের অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি সমাজে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম,

বিলাত-প্রত্যাগত নরনারীর ও প্রগতিপ্রাপ্তা নারীর পক্ষে অবৈধ প্রেম, ডাইভোর্স্‌ প্রভৃতি মোকদ্দমায় সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয় না।

মিঃ এ কে বসু শ্রীযুত জলধি মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মঞ্জুলার কনিষ্ঠা সহোদরার নাম শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবী। তিলোত্তমা শিক্ষিতা ও নব্য-সমাজের উপযোগী আলোকপ্রাপ্তা। ভগ্নীপতি মিঃ বসু তিলোত্তমাকে একটু শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখিতেন। এই শ্রদ্ধাই ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়া ওঠে এবং তিলোত্তমা যখন তখন একা ভগ্নীপতির বাড়ীতে যাইতেন ও তাঁহার সহিত মোটর-ভ্রমণে অভ্যস্তা হইয়া পড়েন। সোলেমান নামক এক মোটর-চালককে লইয়া মিঃ বসু বাড়ী হইতে বাহির হইতেন এবং পথে তিলোত্তমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন। গড়িয়াহাটে পৌছিয়া ড্রাইভারকে সরাইয়া দিয়া দেড়ঘণ্টা কি দুইঘণ্টা পরে মোটরে হর্ণ দিয়া সোলেমানকে ডাকিতেন। এরূপ ঘটনা সন্ধ্যার সময় ঘটিত।

কনিষ্ঠা সহোদরাব সহিত স্বামীর ঘনিষ্ঠতা মঞ্জুলার ভাল লাগিতনা কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়াও স্বামীকে বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেন না, বলিলেই স্বামী অসন্তুষ্ট হইতেন এবং আদালতে মঞ্জুলা যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস কবিতে হইলে একথাও মানিতে হয় যে স্বামী তাঁহাকে প্রহারও করিতেন।

সম্ভবতঃ মঞ্জুলার ইচ্ছাক্রমেই তিলোত্তমার সহিত মিঃ বসুর দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং সম্ভবতঃ এই কারণে মিঃ বসু মঞ্জুলাকে প্রহার করিলে মঞ্জুলা পিতামহের নিকটে গিয়া প্রহারের কথা ব্যক্ত করেন। মঞ্জুলার পিতামহ শ্রীযুত জলধি মুখোপাধ্যায় তখন স্বামী-স্ত্রীর বিসংবাদের মীমাংসার জন্য নাত-জামাইর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জলধিবাবুর উক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, মিঃ বসু তাঁহাকে

বলেন—"আপনি যদি আপনার কনিষ্ঠা নাতনী তিলোত্তমার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে দেন, তবেই আমি মঞ্জুলার সহিত সম্পর্ক রাখিব, নহিলে উহার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমি রাখিব না।

মিঃ বসুর এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া জলধিবাবু দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে বলেন—"তিলোত্তমার সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না। যদি তুমি তিলোত্তমার সংশ্রব পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে মঞ্জুলা তোমার গৃহে বাস করিবে না।"

সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া মিঃ বসু টেলিফোনযোগে তিলোত্তমার সহিত কথা কহিতেন। শ্যালিকা ও ভগ্নীপতির এই কথাবার্ত্তা সময়ে সময়ে এমন ভাষায় হইত, যাহা অপরে শুনিয়া ফেলিলে সঙ্কোচ ও লজ্জার কারণ ঘটিত। একদিন মিঃ বসু টেলফোনে তিলোত্তমার সহিত কথা বলিতেছিলেম,—এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতা জননীর উপদেশে গোয়েন্দাগিরি করিতে যান। তিলোত্তমাকে দাদা যে কথা-গুলি বলিতেছিলেন, ভাইটি আড়িপাতিয়া শ্রবণ করেন। ভ্রাতার এই গোয়েন্দাগিরি মিঃ বসুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পাবে নাই—তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া গোপনে কথা শুনিবার অপরাধে তাহাকে নাকি প্রহার করেন! ভ্রাতাকে তিনি বলেন—"এরূপ আড়িপাতিয়া কথা শোনা অত্যন্ত অন্যায়।"

ভ্রাতা অজিতকুমারও ইহার জবাবে বলেন—"টেলিফোনে আপনি শ্যালীর সঙ্গে যাহা করিতেছেন, তাহা আরও অন্যায়।"

কনিষ্ঠের এই জবাবে ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ নাকি বলেন—"আমি যাহাই কেন করিনা, তাহাতে তোর কি? তুই আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যা।"

কেবল ইহাও নহে। মিঃ বসুর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ মঞ্জুলা দেবী আর একজন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত

করিয়াছিলেন। এই সাক্ষী মিঃ বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুত প্রফুল্লকান্ত বসু। ইহার প্রদত্ত সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তিলোত্তমা খুব ঘন ঘন মিঃ বসুর বাড়ীতে আসিতেন এবং যতক্ষণ তিনি সেখানে থাকিতেন, ততক্ষণ মিঃ বসুর কক্ষেই থাকিতেন। তিলোত্তমার অবস্থিতি কালে মিঃ বসুর কক্ষদ্বার অবরুদ্ধ থাকিত। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন বেলা ৩টা কি ৪টার সময়ে প্রফুল্ল ঐ বাড়ীর ছাদে ঘুড়ী উড়াইতেছিলেন; পাশের বাড়ীর একটী ডুমুর গাছে ঘুড়ী আট্‌কাইয়া যাওয়ায় প্রফুল্ল ঐ বাড়ীর দেয়ালে ওঠেন। মধ্যকার একটী জানালা খোলা থাকিলে ঐ স্থান হইতে মিঃ বসুর ড্রেসিংরুমের ভিতরটা দেখা যায়। জানালাটী ঐ সময়ে খোলা ছিল—প্রফুল্ল জানালা পথে মিঃ বসু ও তিলোত্তমাকে একই শয্যায় সন্দেহজনক অবস্থায় শায়িত দেখিতে পান।

স্বামীর এই আচরণে বিরক্ত হইয়া মঞ্জুলা স্বামীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন। হাইকোর্টে মঞ্জুলা এইমর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, যেহেতু তাঁহার স্বামী মিঃ এ কে বসু আবেদনকারিণীর কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবীর সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত রহিয়া আবেদনকারিণীর উপরে নির্য্যাতন করেন, সেহেতু তিনি স্বামীর সহিত বিবাহ-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন।

আদালতে মঞ্জুলা নিজে এক জবানবন্দী প্রদান করেন, তাঁহার এই জবানবন্দী অপ্রকাশ্য ক্যামেরায় গৃহীত হয়। প্রকাশ্য আদালতে মঞ্জুলার পক্ষ হইতে তাঁহার মাতামহ শ্রীযুত জলধি মুখোপাধ্যায়, দেবর শ্রীযুত অজিত বসু, দূর সম্পর্কের দেবর প্রফুল্লকান্ত বসু ও মোটর ড্রাইভার সোলেমানের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

মঞ্জুলার স্বামী মিঃ এ কে বসুর তরফ হইতে কোন সাক্ষী উপস্থিত করেন নাই এবং মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর

আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিতে তিলোত্তমাকে বা তাহার কোন কৌন্সুলীকে আদালতে হাজির হইতে দেখা যায় নাই।

মঞ্জুলার আবেদন ও সাক্ষীদিগের জবানবন্দী অনুসারে বিচারপতি মিঃ এ কে বসুর সহিত তাঁহার বিবাহচ্ছেদ (Divorce) মঞ্জুর এবং এই বিবাহজাত কন্যাটীকে মাতার নিকটে রাখিবার আদেশ প্রদান করেন।

মিঃ বসু এই মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। হাইকোর্টে যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ উপস্থিত করা হইতেছিল, তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া তিনি—"তৃনাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা" এই বৈষ্ণবীয় নীতিব চরম সার্থকতা প্রদান করেন। সম্ভবতঃ তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদই কাম্য মনে করিতেছিলেন। প্রেমিকের অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া দেয় প্রেমময়ী শ্যালিকার মূর্ত্তি, সে যুগের কবি যাহাকে "মধু হইতে মধুবতর, প্রিয়া হইতে প্রিযতর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এযুগেব কবি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা—
সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা।
নাই তার তুল
মন মশগুল্!
প্রাণ-পাওয়া বাসরের ফুল-মালিকা।

*   *   *   *

এতদিন পরে আজি বুঝেছি মনে
বিবাহ মধুর নয় শালী বিহনে !
শ্যালিকার দান
বড় এক স্থান
অধিকার করে আছে নব-জীবনে ।

* * * *

মোটা পণ-লালসায় মন ভ'রোনা,
শ্যালী যেথা নাই, বিয়ে ক'রোনা ।"

মঞ্জুলা দেবীর মামলাব মত কবিও হয়তো এখানে একতরফা ডিক্রি দিয়াছেন, বিবাহার্থী পাত্র কবিব স্বরে স্বব মিলাইতে চাহিলেও পাত্রের অভিভাবক হয়তো বলিতে চাহিবেন—

"মোটা পণ-লালসায় মন ভ'রো না,
বোন যাব বড়, সেই মেয়ে এনোনা ।"

যথা সময়ে তিলোত্তমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—'

শিশিরকণা মুখার্জ্জী+ভবতোষ সেন

হিন্দু শাস্ত্র বলেন—নারী দেবী। মুসলমান শাস্ত্রকারের উক্তি মতে—নারীর পদতলে স্বর্গ অবস্থিত। এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নারীর প্রতি আচরণ কিন্তু বিভিন্ন। হিন্দু নারীকে বয়ঃসন্ধিকালের পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের রক্ষণাধীনে রাখিয়া তাঁহাকে কুমারীর পবিত্রতা, একমাত্র পতির অঙ্কভাগিণী হইয়া তাহাতেই অনুগত থাকিবার সতীত্ব, পুত্রের জননী-রূপে মাতৃত্ব বা দেবীত্ব সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কন্যাত্ব ও মাতৃত্ব স্বীকার করিলেও মুসলমান নারীর এক পতিত্ব ও সতীত্ব স্বীকার করেন নাই—স্বেচ্ছামত পর পর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। পুরুষের বহু পত্নী গ্রহণে সম্মতি প্রদান ও নারীর এক পতিত্ব বিধান হিন্দু শাস্ত্রকারগণের স্বার্থপরতার লক্ষণ বলিয়া বিধর্ম্মিগণ ও আত্মবিরোধী তথাকথিত হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ ঘোষিত হইলেও নারীর মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রক্ষণে এক পতিত্বই যে একমাত্র পন্থা, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নারীর পদতলকে স্বর্গ বিবেচনা করিয়া যে কোন প্রকারে তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা পুরুষের নারী-ভক্তির চরম-নিদর্শন হইতেও বা পারে, কিন্তু নারীর নিরাপত্তা ও শান্তি তাহাতে ব্যাহত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আসল কথা নারী দেবী, কিন্তু তাঁহাকে দেবীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করিবে পুরুষ—স্নেহ দিয়া, প্রীতি দিয়া, প্রেমের অমৃত-পরশ দিয়া,

অন্তরের শ্রদ্ধাভিবাদন দিয়া। তাহা না করিয়া পুরুষ যদি উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতার পথে তাহাকে পরিচালিত করে, তাহা হইলে সেই কোমল হৃদয়া নারীই হইয়া দাঁড়ায় দানবী। পরিণয় প্রগতির ইতিহাস বর্ণনা কালে নারীর মধ্যে দেবীত্বের পরিবর্ত্তে এইরূপ দানবীত্বের সঞ্চার সন্দর্শনে আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি—আজ ও এইরূপ একটী নিদর্শনই পাঠক-সমীপে উপস্থিত করিব।

শ্রীমতী শিশিরকণার পৈতৃক নিবাস হাওড়া, তাহার পিতৃগৃহের নিকটেই এক ভদ্রলোকের বাস—শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জী ঐ ভদ্রলোকেরই ভাগিনেয। যোগেশচন্দ্রের নিজগৃহ ভবানীপুরে ; কিন্তু সে হাঁওড়ায় মাতুলগৃহেই অধিক সময়ে কাস করিত—তাহার এই মাতুল-গৃহবাসে অনুরক্তির কারণ ছিল শিশিরকণা। শিশিরকণা দেখিতে তেমন স্মন্দরী না হইলেও তখন তাহার শ্রী ছিল, যৌবন ছিল, লাবণ্যও কিছু কিছু ছিল। সে যখন মেট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়িত, যোগেশ তখন আই-এ পাশ করিয়া বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইযাছে। বই-খাতা লইয়া শিশিরকণা স্কুলে রওয়ানা হইলে যোগেশ তাহার পাছু লইত ; বাড়ী হইতে অনেক দূর যাইয়া তবে তাহারা মিলিত এবং শিশিরের স্কুলের অনতি দূরে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইত। একদিন শিশিরকণা যোগেশকে বলিল—আপনি আমাদের বাড়ীতে আসেন না কেন ?

যোগেশ বলিল—তোমাদের বাড়ীর কারুর সঙ্গে যে আমার আলাপ নেই! তাহাতে শিশির বলিল—কেন, আমার সঙ্গে তো আছে। আপনি যাবেন আমাদের বাড়ীতে, আমার বন্ধু বলেই সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

ভরসা পাইয়া যোগেশ শিশিরকণাদের বাড়ীতে গেল—দেখিল, শিশিরের বন্ধু বলিয়া সকলেই তাহাকে খাতির করিতেছে। বাড়ীতে

শিশিরের প্রভাব দেখিয়া যোগেশ মুগ্ধ হইল। কিন্তু তাই বলিয়া যখন শিশিরকণার বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, তখন কিন্তু যোগেশের কথা কাহারও মনে স্থান পাইল না। প্রগতির নেশায় মানুষ যে অতি প্রয়োজনীয় কথাটী বিস্মৃত হয় সেটী হইতেছে এই যে, নারীর একজন মাত্র পুরুষ-বন্ধু থাকিতে পারে, সে তাহার স্বামী। এই কথাটী ভুলিয়া গিযা প্রগতিশীল ও প্রগতিশীলাবা অনেক সময় অনেক বিপদে পডিযাছেন, চষম লাঞ্ছনা ও পরম দৈন্য বহুবাব বহুক্ষেত্রে তাহাদিগকে পীড়িত কবিয়াছে, তথাপি তাঁহাবা এ অমূল্য-সত্যটী মানিয়া চলেন নাই—চলিলে যে তাঁহাদের প্রগতি ক্ষুন্ন হয, অধোগতির কারণ দূবীভূত হয়।

যাহা হউক স্থানান্তরে বিবাহ দিবাব প্রস্তাব করায় শিশিরকণা বলিয়া বসিল যে, যোগেশ ছাড়া অপব কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না—জোব করিয়া অপরের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে সে যে দিকে খুসী চলিযা যাইবে। অগত্যা অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়াই যোগেশের সহিত শিশিরেব বিবাহ দেন। নব-পরিণীতা পত্নী শিশির-কণাকে লইয়া যোগেশ ভবানীপুরে নিজ বাটীতে চলিয়া আসেন। এতদিন যোগেশ তাহার অগ্রজের সহিত একান্ন ছিল; এই বিবাহ লইয়া ভ্রাতার সহিত তাহার মতান্তর হয়—আপনার পৈতৃক-বাটীতেই পৃথগন্ন হইয়া সে বাস কবিবে এরূপ সঙ্কল্প করে।

পিতৃ-পরিত্যক্ত কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকিলেও তাহার আয় বেশী ছিল না। বিশেষতঃ শিশিরকণার ন্যায় আলোকপ্রাপ্তা স্বয়ম্বরা পত্নীকে লইয়া সংসার করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। অগত্যা যোগেশ আপনার এক ধনী বন্ধুর স্মরণাপন্ন হইলেন।

বন্ধু-প্রবরের নাম শ্রীযুত ভবতোষ সেন। যোগেশের ইনি

বাল্যবন্ধু—পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে সম্প্রতি এক বৃহৎ ব্যবসায়েব মালিক এবং সমাজে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠ। ইনি যোগেশের জন্য শতাধিক টাকা বেতনের একটী কাজ জোগাড় করিয়া দিলেন, অন্ধকারে আলোক-প্রদর্শন জন্য যোগেশও বন্ধুবরের নিকটে চিরকৃতজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা-পাশই যোগেশের গলায ফাঁস হইয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ নিজেই ভবতোষের সহিত শিশিরকণাব পরিচয করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পরিচয় স্বত্রে ভবতোষ যোগেশের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ভবতোষের এই যাতায়াত যোগেশ ভাঁল চ'ক্ষেই দেখিত; স্ত্রীকে বলিত—দেখ, ভবতোষ কেমন মহানুভব। নিজে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা একশো বকমের কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু তারি মধ্যে সময় কবে এসে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা বেখে যায়। ওকে খাতিব কবো শিশির, ওর নজব থাকৃলে আমাব অনেক উন্নতি হ'তে পার্‌বে। বন্ধুপত্নী বেড়াইতে যান না শুনিয়া ভবতোষ সন্ধ্যাবেলা নিজেব মোটর পাঠাইয়া দিতেন, যোগেশ আর শিশিরকণা সেই মোটবে হাওয়া খাইতে বাহিব হইতেন।

এইরূপে কয়েকমাস যাইবার পরে যোগেশের অফিসেব কাজ বাড়িয়া গেল, অফিস হইতে বাড়ী ফিবিতে রাত্রি দশটা, এগারোটা বাজিয়া যাইত। এই সময়ে ভবতোষ ড্রাইভারকে দিয়া মোটর না পাঠাইয়া নিজেই মোটর লইয়া আসিতেন, শিশিরকণাকে লইয়া কোন দিন গড়ের মাঠে, কোনদিন বা লেকে বেড়াইতে যাইতেন। ভবতোষ নিজে ড্রাইভ্ করিতেন, শিশিরকণাকে একদিন বলিলেন—শিশির, তুমি মোটর চালাইতে শিখবে? শিশিরকণা বলিল—শিখে কি কর্‌ব ভবতোষবাবু, আমার তো আর জীবনে—বাধা দিয়া ভবতোষ বলিলেন

—সে কি কথা ? কে বল্‌তে পারে তুমি একদিন এই মোটরের মালিক হবে না ?

এই বলিয়া শিশিরকণাকে আনিয়া পাশে বসাইয়া মোটর চালাইবার কলকব্জাগুলি শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। শিশিকণা মোটর-চালনা শিখুক আর নাই শিখুক, সেই হইতে মোটরে বেড়াইবার সময়ে ভবতোষের পাশে তাহার স্থান কায়েমী হইল।

মোটর-ভ্রমণের সখ শিশিকরণাকে এমনি পাইয়া বসিল যে কি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টাগুলি অতিবাহিত হইত, সে তাহা টের পাইত না। এক একদিন এমনও হইত যে রাত্রি দশটাব পবে বাড়ী ফিবিয়াও যোগেশ শিশিবকে ঘবে দেখিত পাইত না। রাগ কবিয়া সে না খাইয়া শুইয়া পড়িত—সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কোন কথাবার্ত্তাই হইত না। এমনভাবে একদিকে যেমন ভবতোষ ও শিশিবকণার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল, অন্যদিকে তেমনি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিল।

সকালে উঠিযাই যোগেশ গিয়া তাহাব বৌদির কাছে বসিত। বৌদিকে বলিত—বৌদি, তোমাদের কথা না শুনেই আমার এই অবস্থা হয়েছে। যে স্ত্রীলোক পরপুরুষের সাথে মেলা-মিশায় একবার তৃপ্তি-বোধ কবেছে, সে কোনদিন স্বামীর ঘরে মাথা পেতে দিতে পারে না। বৌদি বলিতেন—একবার না হয় ওকে নিয়ে কোথাও মাস কতক থেকে এস।

বৌদির কথামত চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া যোগেশ শিশিরকণাকে লইয়া গিরিটি চলিয়া গেল। মাস ছ'য়েক গিরিটি থাকিয়া আবার সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিল। এবারেও ভবতোষ আসিয়া মোটর লইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই শিশিরকণা গিয়া তাহার মোটরে উঠিল।

যাইবার সময়ে যোগেশ বলিয়াছিল—যাও তো চিরদিনের জন্যই যাও। আর ফিরো না যেন।

শিশিরকণা বলিয়াছিল—আচ্ছা।

সত্যই শিশিরকণা আর ফিরিল না। কয়েকদিন পরে যোগেশ সংবাদ পাইল—ভবতোষের সহিত আর্য্যসমাজী মতে শিশিরকণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভবতোষের পূর্ব্বপত্নী খোরপোষ বাবদ এক-কালীন কয়েকহাজার টাকা লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

দাদা ও বৌদির চেষ্টায় যোগেশ পুনরায় একটী বিবাহ করিল। তাহার এবারকার স্ত্রীর বয়স পনেরোর অধিক নহে, বাংলা-ইংরাজী অল্প-স্বল্প লেখাপড়া জানে, হাইস্কুলে কোনদিন পড়ে নাই। নূতন স্ত্রীসহ যোগেশ এখন দাদা ও বৌদির সহিত একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছে; দাদার চেষ্টায় ৪০৲ টাকা বেতনের একটী চাকুরীও তাহার হইয়াছে।

ওদিকে ভবতোষের গৃহিনী হইয়া শিশিরকণা জীবন স্বার্থক জ্ঞান করিতেছে। সমাজে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে—ভবতোষের সহিত সে ক্লাবে যায়, পার্টি প্রভৃতিতেও যোগদান করে, এক বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী স্বয়ং শিশিরকণা। একদিন নাকি দৈবাৎ যোগেশের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া পড়ায় সে দুইহাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া যোগেশকে বলিয়াছিল—নমস্কার যোগেশ বাবু, ভাল আছেন? নিজের এই পরিবর্ত্তনের জন্য শিশিরকণা আদৌ দুঃখিত নহে—কারণ নূতন জীবনে সে সুখী, সমাজে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা, বিপুল সম্মান।

সমাজে শিশিরকণা প্রতিষ্ঠা ও সম্মানলাভ করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের আধ-ফেরঙ্গ সমাজের এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এখানে ভবতোষ-শিশিরকণারাই প্রতিপত্তি লাভ করিবে আর যাহারা তাঁহাদেরই

সমশ্রেণীর কিন্তু অভাবগ্রস্থ তাহারা নির্য্যাতন ভোগ করিবে। অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে রংপুরের উকীল শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস বি, এ, বি-এল্ পরিমল নাম্নী একটী ষোড়শী ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ের দরুণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কার্য্যতঃ পরিমল শিশিরকণারই দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র; সে স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে-ছিল এবং পিতার সঙ্গে শশীবাবুর গৃহে অতিথি হইয়া—শুনা যায়, স্বেচ্ছায়ই তাঁহার নিকটে আত্মদান করিয়াছিল। পরিমলের পিতার উদ্যোগে আদালতে শশীভূষণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইলে পরিমলের ন্যায় স্বামীত্যাগিনী নারীর অভিযোগে তাঁহার কারাদণ্ড হয়।

শশীভূষণের এই কারাদণ্ডে নাকি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে— আইনের চ'ক্ষে ন্যায়ের মর্য্যাদা কতখানি তাহা পরিমাপ করিবার স্থান ও সময় ইহা নহে। কিন্তু সমাজও কি ন্যায়ান্যায়কে এই মাপকাঠীতেই পরিমাপ করিবে? স্বামী ত্যাগিনী বিপথগামিনী রমণীর সহবাস যদি অপরাধ হয়, তবে অপরের বিবাহিতা পত্নীকে, তাকে তাহার সংসার-সুখ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া ধর্ম্মান্তরের ছলনা গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করাও কি অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না? অথচ সমাজ এই সকল ব্যক্তিকেই উচ্চ আসন প্রদান করিয়া থাকে। ইহারাই সুনীতি-সঙ্ঘের, অবলা উদ্ধারের, নারী আশ্রমের ভারগ্রহণ করিয়া সমাজে সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতেছে। ইহারাই কংগ্রেস, কাউন্সিল, কর্পোরেশন, প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মোড়ল—ইহাদিগকে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের কল্যাণজনক প্রতিষ্টানের সদস্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ একবারও তাহাদের চরিত্রের বিষয় ভাবিয়া দেখেন না।

মিসেস্ সুশীল মিত্র + মিঃ এন, আর দাসগুপ্ত

অনেকেরই মুখে একটী প্রশ্ন শোনা যায়—প্রগতি বস্তুটী কি? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রগতি শব্দটীর ধাতুগত অর্থ যাহাই হৌক্, আমাদের মনে হয় গতি যেখানে গতি-বেগেই আত্মহারা হয়, লক্ষ্যপথ ভুলিয়া গিয়া গতির আনন্দে গত্যন্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া অনির্দ্দেশ্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সেখানে তাহাকেই প্রগতি আখ্যায় আখ্যাত করা চলে।

বেশীদূর যাইতে হইবে না, আমাদের দেশের সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্যবিধ অগ্রগামিতা হইতেই ব্যাপারটা বুঝা যাইবে। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে আমরা যেদিন পরাধীনতার অন্তঃপ্রদাহ অনুভব করিতে শিখিয়াছি, সেদিন হইতেই আমাদের দেশের ও আমাদের সমাজের যত কিছু দৈন্য, অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি। শিক্ষার মায়াঞ্জন চোখে পরিয়া সভ্যতার রঙ্গে রঙীন্ হইয়া আমরা বর্ত্তমান জগতের গতিশীলতাকে অনুভব করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারই সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। নিজেদের conception বা ধারণানুযায়ী উন্নতির অভিমুখী জাতীর এই যে অগ্রগামিতা, পরিমিত ও সীমাবদ্ধ অবস্থায় ইহাকে জাতীয় গতি বলা চলে। এই গতি যতক্ষণ লক্ষ্যপথ অভিমুখী বিশ্বস্ত অগ্রগামিতা মাত্র ছিল, ততক্ষণই ছিল ইহা জাতির প্রাণশক্তি স্বরূপ। কিন্তু গতির নেশা যখন লক্ষ্যপথ ছাড়াইয়া গতি-বেগকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া বিভ্রান্ত

করিয়া জাতিকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলিল, তখন সে গতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রহিতে চাহিল না। গতিই তখন দাঁড়াইল—প্রগতি। অশ্বের দ্রুতগামীতা আকঙ্খণীয় হইলেও সে যখন সহিসের নির্দ্দেশ ছাড়াইয়া স্বেচ্ছামত ও স্ব-মনোনীত পথে ক্রমাগত চলিতে থাকে, সেখানে সে গতি ছাড়াইয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

রিপন কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুশীলকুমার মিত্র এম্‌এ, পি এইচ্ ডি, ডি লিট্ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত এম-এ উভয়ে বিলাত-ফেরত। সর্ব্ববিধ বিষয়ে তাঁহাদেব অগ্রগামিতা যে সমাজে আদর্শস্থানীয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গতিশীলতা বা অগ্রগামীতার নিদর্শন স্বরূপ নিরদরঞ্জন বন্ধু সুশীলকুমারের গৃহে যাতায়াত করিতেন এবং সুশীল কুমারের পত্নীও স্বামী-বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামিশা করিয়া এই অগ্রগামীতাবই পরিচয় দিতেন। যাতায়াতের মধ্য দিয়া যে গতিশীলতা প্রকাশ পাইত, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল প্রগতি। ভবিষ্যতে যখন বঙ্গভাষায় নূতন অবিধান রচিত হইবে, 'প্রগতি' শব্দের এই ব্যাখ্যাটী তাহাতে সন্নিবেশিত হইবে আশা করি।

বস্তুতঃ সুশীলকুমার ও নীরদরঞ্জনের মধ্যে যেরূপ বন্ধুত্ব ছিল, সেরূপ অকৃত্রিম প্রণয কচিৎ দেখা যায। শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীবে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে, দুর্য্যোধন ও কর্ণে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের যে মহান ইতিহাস হিন্দুর দুই মহাগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, এ বন্ধুত্বের সহিত তাহারও তুলনা হয় না। মহাকবি সেক্সপীয়র বুঝি এমনি গন্ধুত্ব কাহিনী রচনা করিতে গিয়া তাঁহার "মার্চ্চেণ্ট্ অব ভেনিস্" নামক মহানাটকে এণ্টনিও ব্যাসানিও চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তখন

মরিয়া হইয়া "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকে সীজাব ও ব্রুটাসের চিরস্মরণীয় প্রণয়োপাখ্যানের পরিকল্পনা করিলেন। যাহারা সুশীলকুমার ও নীরদরঞ্জনের অকৃত্রিম প্রণয়-চিহ্ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যে ইহারা যথাক্রমে সীজাব ও ব্রুটাসের সহিতই তুলনীয়।

সুশীলকুমার ও নীবদরঞ্জন উভয়ে উভযের বাল্যবন্ধু। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া দুইজনে যেখানে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিলেন, সেইখানেই বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবাব সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বন্ধুকে বন্ধুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন কবে, বাল্যবন্ধুত্বের এই যে বহুশ্রুত অভিশাপ, দুই বন্ধুই অভিশাপবাণী ব্যর্থ কবিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে, কর্ম্মক্ষেত্রেব বিভিন্নতা ইহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। কর্ম্মক্ষেত্রেব বিভিন্নতা ব্যতিরেকে আর একটী বস্তু এই বন্ধু-যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিতে পাবিত—সেটী হইতেছে বিবাহিত জীবন। কিন্তু বিবাহিত হইবাব পরক্ষণই নবোঢা স্ত্রীর প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া যাহারা বহির্জ্জগতেব—বিশেষ কবিযা পূর্ব্বজীবনের সমুদয় সম্পর্ক ভুলিয়া যান নীরদরঞ্জন সে শ্রেণীব লোক ছিলেন না। বিবাহিতা পত্নীকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া একান্তভাবে তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিবার মত সঙ্কীর্ণতা নীরদরঞ্জনের উদাব অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। অন্যদিকে সুশীলকুমারের বিদুষী সহধর্ম্মিণী একমাত্র স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া যুড়িযা না থাকিয়া স্বামীর বন্ধু-বান্ধবকে আদর আপ্যায়ন করিতেন। স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে যে স্বামীর প্রণয়ভাগী বন্ধুবান্ধবকে আপন করিয়া তুলিতে হইবে, তাঁহার চিত্তে এটুকু প্রসারতা লাভে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই সুশীলকুমারের প্রেমময়ী পত্নীর অন্তর্ব্বর্ত্তিতায় বন্ধু-যুগল

বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং পরস্পরের সহিত অধিকতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সুশীলকুমার ও নীরদরঞ্জন দুইজনেই বিদ্বান, দুইজনেই সাহিত্যানুরাগী। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও সুশীলকুমার-পরিচালিত বিচিত্রায় আমরা দুই বন্ধুকেই সাহিত্য-রচনা করিতে দেখিয়াছি। যে সাহিত্যিক instinct বা প্রেরণা বন্ধু-যুগলের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, সুশীলকুমারের প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীই তাহাকে উদ্দীপিত করেন। তিনি নিজে বিশেষভাবে কাব্যানুবাগিনী, যাঁহারা অষ্টপ্রহর কাব্যলোকেই বাস করেন. কাব্যময় স্বপ্নে দেখেন, ছন্দে কথা বলেন, ছন্দে চলেন—হাতে রবিঠাকুরেব কাব্য, মুখে নজরুলের গজল অন্তরে ভারতচন্দ্রের কাব্য-সুধা, চ'ক্ষে বায়বণেব কাব্য-দৃষ্টি আর অধবে ওমর খৈয়ামের কাব্য-তৃষ্ণা, তিনি যেন তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার আগ্রহে তাঁহারই প্রস্তাবে দুইবন্ধু একত্রে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন—পত্রিকাখানির নাম দেওয়া হইল "লেখা"। পত্রিকার নামকরণ বোধহয় মিত্র-গৃহিণীই কবিযাছিলেন কিন্তু নামটি নীবদরঞ্জনের এত পছন্দ হইয়াছিল যে তিনি বন্ধুপত্নীকেও ঐ নামে ডাকতে সুরু করিলেন। ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—এ আপনার অন্যায় ঠাকুরপো, আমি কি আপনাদের কাগজ নাকি ?

নীরদরঞ্জন বলিয়াছিলেন—আপনি কাগজেব কায়া না হ'লেও তার প্রাণ তো বটেন! অন্তর থেকে আপনি এতে শক্তিসঞ্চার করেন বলেই তো আমরা তাতে রূপ দিতে পারি।

কিন্তু তাতে মুস্কিল আছে। আপনাদের কাগজ 'লেখার' দুই সম্পাদক, আমার তো তা নয়—কথাটা কাড়িয়া লইয়া নীরদরঞ্জন বলিয়াছিলেন—এ লেখার আমরা যুগ্ম-সেবক।

নীরদরঞ্জনের প্রদত্ত এই নামে মিত্র-গৃহিণী আপত্তি করেন নাই, বরং এই নামে অভিহিত হইতেই তিনি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহারই বাসানামুযায়ী আমরা আমাদের এই আখ্যায়িকায় তাঁহার এই নামটীই ব্যবহার করিব। সুশীলকুমারের স্ত্রীর আসল নাম শ্রীমতী বেলা মিত্র।

লেখার চেহারাটী কিন্তু রেখার মত নহে—বেশ গোলগাল, নাদুস্ নুদুস এই চেহারা লইয়া সুশীলকুমার সময় সময় তাঁহাকে বেশ একটু খুনসুরি দিতেন, কখনও বলিতেন—ছানার দর কি সস্তা হ'ল ? কখনও বা বলিতেন—যাই বল লেখা তোমার চেহারাটী কিন্তু রসগোল্লার মত। শুনিয়া লেখা বলিতেন—তাই বলে গিলে খেওনা যেন। সুশীল আবাব বলিতেন—সে ইচ্ছে যে কখনও হয় না এমন কথা বল্‌তে পারিনে। লেখা বলিতেন—অতি লোভে তাঁতী নষ্ট জান তো ? ঐ তোমার বন্ধু আস্‌ছেন।

"লেখা" কাগজখানি সাহিত্যিক খেয়ালের বশে নীরদরঞ্জন ও লেখার যুগ্ম-প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করিয়াছিল ; পশ্চাতে কোন ব্যবসায়-বুদ্ধি নিয়োজিত না হওয়ায় কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেল। "লেখা" কাগজ বন্ধ হইল কিন্তু লেখার লেখা নাম ঘুচিল না, নীরদরঞ্জনের সহিত তাঁহার কাব্যালোচনাও বন্ধ হইল না। বরং কাব্যালোচনার সুবিধার জন্য লেখা নূতন একখানি কাগজ বাহির করিবার জন্য স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বহু টাকা লোকসান যাওয়ায় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বিচিত্রা" নামক জনপ্রিয় মাসিক পত্রখানি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইতেছিল। উপেনবাবুর অনুরোধে এবং লেখার তাগাদায় সুশীলবাবু "বিচিত্রা"র পরিচালনা ভার গ্রহণ

করেন। নীরদরঞ্জন এইরূপে সুশীলবাবুর বাড়ীতে প্রায় স্থায়ী আড্ডা জমাইলেন। সকাল হইতে ৯৷৷০ টা ১০ পর্য্যন্ত এবং বিকাল ৩টা ৩৷৷০ টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তিনি এই বাড়ীতেই পড়িয়া রহিতেন। "বিচিত্রা" পরিচালনায় তিনি সাহায্য করিতেন, মাঝে মাঝে 'বিচিত্রা'র জন্য দু' একটা প্রবন্ধ কবিতা লিখিতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি লেখার সহিত সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন।

'বিচিত্রতা' হইতে নীরদরঞ্জনের কয়েকছত্র কবিতা এখানে মুদ্রিত হইল।

"সদ্য তোমার স্নানের পরে বুঝি
চুল এলিয়ে রঙীন সাড়ী পরা,
যৌবনেতে রং লাগাবে বলে
এমন প্রাতে আপনি দিলে ধরা।
তোমা বিনে যেন রূপের মেলা
মিছে হত এমন সকাল বেলা।"

* * *

"কিংবা বুঝি চুল শুকাবে বলে
এলে তুমি স্নানের পরে একা,
চুল এলিয়ে খানিকক্ষণের তরে
ঐ ওপারে দিলে আমায় দেখা;
সকাল বেলার রৌদ্রটুকু মেখে
তোমার ছবি দিলে প্রাণে এঁকে।"

* * *

"শীতের সন্ধ্যা উঠেছে কেঁপে
আঁধার ঘনায় কালো,
আজকে তুমি বারেক তোমার
প্রদীপখানি জ্বালো ;
পূন্যা নদীর ঐ ওপারে
কলাগাছের সারির ধারে
তোমার বাড়ীর তুলসীতলায়
একটুখানি খালি
বারেক এসে দাঁড়াও তুমি
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি ।"

*   *   *

"ভুবন ভরা রূপের মেলা
শেষ হয়েছে আজ,
আজকে তুমি বারেক পর
তোমার রঙীন সাজ ;
অবশ পরাণ হিমে কাঁপে
অন্ধ আঁখি কালর চাপে"
তোমার রঙীম্ সাড়ীর আঁচল
দাও উড়িয়ে প্রাণে
তোলো তোমার প্রদীপ শিখা
আমার নয়ন পানে ।"

*   *   *

"তুমি এসো বিজয়নী
ভুবন করো জয় ;
রাজকন্যা ! আজকে তোমার
পেলাম পরিচয় ;
মুছে ফেলো বিরাট কালো
নয়ন দুটোয় অগ্নি জ্বালো
আকাশ পানে বারেক তাকাও
সেই সে ছোঁয়া লেগে
হাজার আলোয় গগণ ভরে
উঠুক তারা জেগে ।"

এই প্রকার কবিতা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে লিখিত নহে তাহা বলাই বাহুল্য ।

বিলুপ্ত "লেখা" অপেক্ষা "বিচিত্রা" অনেক উচ্চশ্রেণীর কাগজ। লেখাব আগ্রহাতিশয্যে সুশীলকুমার বহু টাকার দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া বিচিত্রার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি "বিচিত্রা" লেখাকে ততটা তৃপ্তি দিতে পারিত না, যতটা তৃপ্তি দিত "লেখা"। এজন্য তিনি অপশোষ প্রকাশ করিলে বলিতেন—কেন, "বিচিত্রা"কেও তো আমি তোমারই বিচিত্র রূপের অভিব্যক্তি বলে মনে করি। নাম নিয়ে যদি আপশোষ হয়ে থাকে তাহ'লে না হয় এখন থেকে তোমায় "বিচিত্রলেখা" বলে ডাকব।

বলা বাহুল্য তাঁহারা এ প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন—যখন তখন লেখাকে 'বিচিত্র-লেখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

নীরদরঞ্জনের সহিত লেখার সাহিত্য-চর্চ্চা অনেক সময় বিবিধ ও

বিচিত্র গতিতে চলিত। একদিন নীরদ আসিয়া বলিলেন—লেখা, রবিবাবুর নষ্টনীড় পরেছো ?

লেখা প্রশ্ন করিলেন—নষ্টনীড়ের কথা যে হঠাৎ ? কারু নীড় নষ্ট করিতে চল্‌ছো নাকি ?

নীবদ করিলেন—'নীড় কি আর কেউ কারুর সঙ্কল্প করে নষ্ট করে ? যে নীড় নষ্ট হ'বার সে আপনি হয়ে যায়।

লেখা বলিলেন—এটা তোমার মিথ্যা কথা ঠাকুবপো, ভূপতির নীড়টা নষ্ট হত না, যদি না মাঝখানে অমল এসে পড়ত !

নীরদ বলিলেন—অমল তো এসে পড়েছিল মাত্র। বন্ধু ভূপতির সুখ নীড় নষ্ট করিবার জন্য অমলের এতটুকু মাথা-ব্যাথা ছিল না।

লেখা বলিলেন—তবু তো নীড় নষ্ট হয়ে গেল আব তার উপলক্ষ্য হ'ল ঐ অমলই।

নীরদ বলিলেন—কিন্তু তাব জন্য দায়ী তো একা চারুই। অমল কি তাকে যেচে বলেছিল, ওগো, তুমি আমায় ভালবাস—তুমি আমাকে তোমার যৌবন-মধু ভবা সবটুকু মনপ্রাণ সঁপে দাও ?

লেখা তর্ক তুলিলেন—ঐ খানেই তো তোমাদের একচোখা দৃষ্টি নীরদ বাবু। অমল না হয় যেচে কিছু চায়নি ! কিন্তু সে যে তার তারুণ্যভরা দেহ-মন নিয়ে চারুর অতৃপ্ত-ঘেরা যৌবনের কুঞ্জদ্বারে এসে হাজির হ'ল, এটা কি তার জ্ঞান-কৃত না হোক্ অজ্ঞান-কৃত অপরাধ ও নয় ?

নীরদ জবাব দিলেন—এটা কিন্তু আইনের চোখে অপরাধের আমলে আসে না !

লেখা বলিলেন—রেখে দাও তোমার আইন। আইন তো ভূপতির পত্নীর ফুটন্ত যৌবনের প্রতি ঔদাসীন্য আর চারুর নিঃসঙ্গ যৌবনকুঞ্জের

বিফল প্রতীক্ষাকে গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ৎ বলে বিবেচনা করবে না। এমন কি অমল যদি তার বন্ধু পত্নীর কাছে মুখে প্রেম-নিবেদন না করে আকারে ঈঙ্গিতে বা চোখের দৃষ্টিতে ভালবাসা জানিয়ে থাকে, সেটাকেও আইন আসামী-পক্ষে সাক্ষী বলে গ্রহণ করবে না। আইন 'রেফ' কেসের জন্য, বড জোড় ফুস্‌লানো নিয়েও আইনের ঘরে মামলা উঠ্‌তে পারে; কিন্তু মনের বাসনা-কামনার চুল-চেরা বিচার সে কর্‌বে কি করে ?

নীরদ কথার স্রোত ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন—আচ্ছা, আইন না হয় বিচারে অসমর্থ হয়েছে। কিন্তু তোমাদের কবি—তিনিই কি স্থবিচার করেছেন ?

লেখা বলিলেন,—এ কথাটা কিন্তু তোমার নেহাৎ অসাহিত্যিকের মত হ'ল নীরদবাবু! কবির কাজ কি বিচাব করা ? তিনি সমস্যাটা জাগিয়ে দিয়েছেন—স্বামীরূপ কাষ্টময দেবতা বিদ্যমানেও যে স্ত্রীর মনে পবপুরুষ দিয়ে বাসনা তৃপ্তির সাধ জাগ্‌তে পারে আর তা জাগাটা যে অস্বাভাবিকও নয় এবং অন্যাযও নয়, কবি এইটুকু প্রত্যেক নর-নারীকে স্মবণ করিয়ে দিয়েই খালাস। কবির কর্ত্তব্য কবি করেছেন, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা বেছে নাও।

এমন সময় এক বান্ধবী প্রশ্ন করিলেন—তুমি যদি চারু হ'তে বৌদি তাহ'লে কোন্ পথ বেছে নিতে ?

লেখা জবাব দিলেন,—প্রথমতঃ ভূপতির মত স্বামীর জন্য যে আমি বসে থাকৃতুম না, এটা ঠিক। তারপর কি যে করতুম সেটা নির্ভর করৃত আমার অমলের উপরে। তোমাদের গল্পের অমল কিন্তু চারুকে জীবন-সঙ্গিনী করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হয়—সে শুধু ব্যাঘ্রের মাংস-লোলুপতা জাগিয়েই নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। বোকা চারুর মত তেমন মানুষের পেছনে আমি নিশ্চয়ই ছুটাছুটি

করতুম না। আমি সন্ধান করতুম সেই তৃতীয় মানুষের—আমার অতৃপ্ত দেহ-মন যাকে আশ্রয় করে তৃপ্তির ফসলে ভরে উঠতে পাবত, লক্ষ ভূপতিকেও গ্রাহ্য না করে যে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহভরে তার বলিষ্ঠ হাতখানি বাড়িয়ে দিত।

একটু থামিয়া আবাব তিনি কহিলেন—"সত্যি, আমি সেই কথাই ভাবি। রবিবাবু আমাদেব ভাবগুরু, তাঁর হাতের কাব্য-বর্ত্তিকা আমাদের পথ দেখাবে। তাঁব নষ্টনীড়ের আদর্শে আমরা দেশের সব জীর্ণ নীড় ভেঙ্গে ফেলে নূতন কবে নীড় গড়ব। তিনি যদি চারুকে আমাদেব সাম্‌নে তুলে ধরলেন নারীত্বের আদর্শ করে, তো অমলকে কেন গড়্‌লেন না আদর্শ পুরুষ করে—দেশের কাপুরুষ ভূপতিরা যার কাছে শিক্ষা পেতে পার্‌ত আর "পেটে খিদে মুখে লাজ" গোছেব তরুণেরা যাকে আদর্শ করে বেপবোয়া হ'য়ে, সত্যিকার পুরুষ হয়ে উঠতে পারত!

তখন অন্য এক বন্ধু বলিলেন—অমল বিলেত থেকে এসে কি করেছিল, তা না দেখেই কেন তাকে খাটো কর্‌ছ! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর লেখাদি, অমল তাই করবে। চারুকে তার অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ভূপতির জীণ ঘরে গুম্‌রে মর্‌তে সে কিছুতেই দেবে না। তুমি জেনো লেখাদি—অমল এ করবেই।

বিচিত্রার একতাড়া প্রুফ আর রিপন কলেজের ছাত্রদের বাৎসরিক পবীক্ষার কতকগুলি খাতা লইয়া সুশীলবাবু এই সময়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করায় সেদিনকার আলোচনাটা আব বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই বটে, কিন্তু আধুনিকতার মন্ত্রগুরু রবীন্দ্রনাথ যে ডাঃ সুশীল মিত্রের মত বাংলার অনেক ভূপতিরই সুখের নীড় নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থাপত্র রচনা করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে দায়ী না করিয়া পারি কি করিয়া। সুশীলকুমার হয়তো এজন্য রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

আনিবেন না, আনিলেও হয়তো মিঃ এন্ আর দাশগুপ্তের মত ব্যারীষ্টারগণের আইনের কূটতর্কজালের দরুণ নিজের পক্ষে ডিক্রি পাইবেন না; কিন্তু চারু-বিমলা-বিনোদিনীর দৃষ্টান্তে যে সকল নারী বিপথগামিনী হইয়াছে বা হইবে, তাহারা যখন উত্তরকালে একদিন পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করিবে, সেদিন তাহারা তাহাদের শোচনীয় অবস্থার জন্য বিশ্ব-কবিকে লক্ষ্য করিয়াই পুনঃ পুনঃ অভিশম্পাতবাণী উচ্চারণ কবিবে নাকি? হায়, অভিশম্পাতবাণী উচ্চারণেই বা কি ফল হইবে! অশ্রুতে অশ্রুতে অভাগিনীদেরই বুক ভাসিয়া যাইবে, সে অশ্রুপ্রবাহ নব নব দেশে সম্মানের সওগাত আনয়নে অভিযানকারী বিশ্ব-কবির অর্ণবপোতকে এতটুকুও টলাইতে পারিবে না, তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া কি পারস্য-ইবাক ইস্তাম্বুলবিজয়ী বিশ্বকবিব বিশ্ববিমানকে তাহার গৌরবময় গতিপথে স্তব্ধ করিয়া দিতে পাবিবে? অথবা বৃথাই আমরা এ প্রলাপ বকিতেছি, কবিগুরুব নষ্টনীড় যাঁহাব নীড় নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যখন তাঁহারই এদিকে দৃষ্টি নাই, তখন আমাদের এ আপশোষ নিতান্তই বৃথা। ঋষি-কবির আর্ষমন্ত্র প্রয়োগে এক নীড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি নূতন করিয়া নীড় গড়িয়াছেন; তাঁহার শূন্য নীড আজ নূতন গীতিকুহরে ধ্বনিয়া উঠায়, সেই আনন্দে বিশ্বপ্রেম অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি তাঁহারই নীড় নষ্টকারী বিশ্বকবির চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত বিচিত্রার প্রধান গর্ব্ব উহাতে রবীন্দ্রনাথের যত লেখা প্রকাশিত হয়, তত আর কোন পত্রিকায় হয় না। যদি তিনি বুদ্ধিমান হইতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ কবির চরণ-বন্দনা করিয়া বলিতেন—"কবিবর, অমি প্রতিমাসে তোমার বহু রচনা প্রকাশ করিব, তোমার রচনার আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর দিব; তোমার পারস্য-ভ্রমণ কাহিনীর নীলামে প্রবাসী

অপেক্ষা চড়া দর হাকিব। কেবল তুমি এই কর, যেন নূতন করিয়া নষ্টনীড়ের অভিচার-মন্ত্র উচ্চারণ করিও না। হয়ত তোমারই একবারের মন্ত্রোচ্চারণে আমার একটী নীড় নষ্ট হইয়াছে, আবার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আমাকে পথে বসাইও না। বাংলার স্বামীকুল নির্ব্বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সত্যসত্যই নিষ্কাম নহে। দোহাই কবি—তোমাব শান্তিনিকেতনের দোহাই, তোমার নারী-নৃত্য-সঙ্ঘেব দোহাই, তোমার বিশ্বমানবতার দোহাই, বাঙ্গালী নারীব সতীত্বকে আর তুমি নীলামে চড়াইও না। "বাংলার মাটী, বাংলার জল" বলিযা একদিন যে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, তোমার সেই কুম্ভীরাশ্রুর দোহাই —তোমার ঘর-ভাঙ্গা মন্ত্রের আর্ষ্য প্রয়োগ হইতে তুমি বিবত হও ঋষি।"

নীরদরঞ্জনের সহিত লেখাব সাহিত্যালোচনা এত বেশী হইত যে সুশীলকুমারের বাডীব অনেকে তাহা পছন্দ কবিতেন না। পর্দ্দাব বালাই এবাড়ীতে ছিল না। মেয়েবা আবশ্যক হইলে অপরিচিত পুরুষগণের সম্মুখেও বাহির হইতেন—স্বামীর পুরুষ বন্ধুগণের সম্মুখে তো দূরের কথা! কিন্তু তথাপি লেখার এই মাখামাখি কাহারও ভাল লাগিল না। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিবে কে? এ বাড়ীতে সকলেই লেখাকে ভয় করিয়া চলে—সুশীলবাবু নিজে সহজে লেখাকে কিছু বলেন না, লেখাব জ্যৈষ্ঠ ভাজ পর্য্যন্ত লেখার কোন কাজের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না।

অবশেষে একদিন নাচার হইয়া বড়বাবু সুশীলবাবুকে এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন। বড়বাবু যে সকল অভিযোগ করিলেন, সুশীলকুমার তাহার কোনটী প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রতিবাদ করিবেন কি, তাঁহার বিবেকই বলিতেছিল—প্রত্যেকটী অভিযোগই

মিথ্যা। সাহসে ভর করিয়া অবশেষে একদিন সুশীলবাবু সাধ্বী স্ত্রীর নিকটে কথা পাড়িলেন। বলিলেন—তাঁহার বৌদির ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের অসুবিধা হয়, নীরদ যখন আসেন লেখা যেন তাঁহার সহিত বাইরে বসিবার ঘরে বসিয়া বা সুশীলবাবুর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহে। একথার উত্তরে লেখা কহিলেন যে, নীরদের সম্মুখে তো তাঁর জা এবং আর আর মেয়ে বাহিরে হ'নই, সুতরাং তাঁদের অসুবিধার কি থাকতে পারে? প্রত্যুত্তরে সুশীলবাবু কহিলেন—বাহিরের পুরুষের সম্মুখে বাহির হওয়া এক কথা, আর তাহার সহিত সকালে বিকেলে অনেকগুলি ঘণ্টা কাটানো এক কথা। বাড়ীর মধ্যে অনেক সময়েই হয়তো মেয়েরা তাঁদেব পরিধানের কাপড়-চোপড়গুলো ঠিক রাখেন না—সেটা না রাখা নিজ বাডীতে থাকার ন্যায্য সুবিধাটুকু বাডীর মেয়েদের দিতে হবে বৈকি! ইহার জবাবে লেখা যাহা বলিলেন তাহাতে সুশীলকুমার সন্তুষ্ট হইলেন—"আচ্ছা, এর পরে নীরদ যখন এসে আমার ঘরে বস্‌বে, আমি সাবধান হ'ব।"

লেখা তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—নীরদরঞ্জনকে নিজের ঘরে বসাইয়া পরদা টানিয়া দিতেন।

এ সংসারের মানুষের উপরে বিধাতার এক নিদারুণ অভিশাপ এই যে অপরের ভাল কেহই দেখিতে পারে না। দার্শনিক সুশীলকুমারে আপন-ভোলা ভাবে ব্যথিতা লেখা যে দু'দণ্ড স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নীরদরঞ্জনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজের মনের অপরিসীম বেদনা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া শীতপ্রধান স্থানের অধিবাসী যেমন নিজেকে গরম করিয়া লয় কিংবা কঠোর পরিশ্রমের অবসানে বড় সাহেব যেমন একটী পেগ টানিয়া আপনাকে stimulent

(সজীব) করিয়া লয় তেমনি দুঃসহ স্বামীসঙ্গের পরে বন্ধু সঙ্গলাভে আপনাকে fresh (তাজা) করিয়া লইবে, ইহা কাহারও সহ্য হইত না। অকারণে তাঁহারা নানা রকমের টিট্‌কারী দিতেন, কেহবা দরজার আড়াল হইতে দু'চারটী কথা শুনাইয়া দিতেও কশুর করিতেন না।

নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ ও নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একটু সান্নিধ্য ঘটিলেই লোকে এত ক্ষেপিয়া যায় কেন তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। এই সেদিনও কোন সংবাদপত্রে এসোসিয়েটেড প্রেস প্রেরিত তারে দেখিতে-ছিলাম যে, অনশন-ক্ষান্ত মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বংশ-সম্ভূতা কুমারী উমা নেহেরু বি-এ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্যের সহিত যখন ট্রেণ-যোগে ফিরিতেছিলেন, তখন পুণা ষ্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় তাঁহাদের অবস্থান করিতে দেখিয়া প্লাটফর্ম্ম-স্থিত কতকগুলি দুষ্ট ছোক্‌রা তাঁহাদের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া জানালার শার্শী ভাঙ্গিয়া কুমারী উমাকে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছিল। এক্ষেত্রে আঘাত-কারী ছিল অপোগণ্ড বালক, নহিলে মনে করিতে পারিতাম যে, নিঃসম্পর্কীয় দুই যুবক যুবতী (কুমারী)কে একত্রে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ভাবিতেছি—লোকের কেন এ মাথাব্যথা!

হায় বিধাতা! পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দিয়াছ, অথচ সে আকর্ষণ সহ্য করিবার ক্ষমতা মানুষকে দাও নাই। এই অক্ষমতা আবার বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী—তাহাও আবার যেখানে আকৃষ্ট পুরুষ ও নারী বাঙ্গালী। রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেক সময়ে অনেক সাহেব-মেমকে পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিতে দেখা যায়।

ইডেন গার্ডেন, বোটানিকাল গার্ডেন বা ঢাকুরিয়া লেকে অনেক সাহেব মেমকে পরস্পরের কটি-বেষ্টন করিয়া বা অন্যবিধ প্রকারে ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য-স্থাপন করিয়া চলিতে দেখি, তাহাতে আমাদের চিত্তবিকাব উপস্থিত হয় না। অথচ একজন বাঙ্গালী পুরুষ তাহার বান্ধিতের সহিত ঐভাবে পথ চলিতেছে দেখিলে আমরা শিহরিয়া উঠি। কয়েক বৎসর আগে পরেশনাথের মন্দিরে এই ধরণের একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একটী সাহেবী পোষাক-পরিহিত বাঙ্গালী যুবক তাহার সঙ্গিনী যুবতী বঙ্গ-ললনাকে গাউন পরাইয়া মন্দিরে বেড়াইতে আনিয়াছিল। মোটর হইতে নামিয়া গাউন-পরা বঙ্গললনা নিজেকে এত সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিলেন যে তাঁহাব মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল— দু'হাতে বুকের উপরার্দ্ধ ঢাকিয়া তিনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছিলেন না—দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, পুরুষটী জোর করিয়াই সঙ্গিনীকে গাউন পরাইয়াছেন, পরিয়া কোনমতে চোখ বুজিয়া মোটরে উঠিয়াছেন ; এখন জনতার মধ্যে শাড়ীহীন অবস্থায় নিজেকে যেন নগ্ন বলিয়া বোধ করিতেছেন। যুবকটী আবার তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিল, সেইভাবে তাঁহাকে ঠেলিয়া মন্দিবের দিকে লইয়া গেল। এদিকে মহিলাটীর সলজ্জ অবস্থা মন্দির-প্রাঙ্গনে ক্রীড়মান বালক-বালিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খেলা ছাড়িয়া তাহারা ঐ যুবক যুবতীর পশ্চাৎ হৈ হৈ শব্দে ধাবিত হইলে মন্দির-ভ্রমণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অল্পসময় মধ্যে তাহাদিগকে গাড়ীতে গিয়া উঠিতে হইল। আমি ভাবিলাম—সত্যই তো, আমাদের দেশের লোকদের কি শোচনীয় অধঃপতন। যদি বা কেহ সঙ্কোচের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অগ্রগামীতার পরিচয় প্রদানে সক্ষম হয় তো আমরাই আবার তাহাদিগকে অবনমিত করিতে চাই।

লেখা এদেশীয়গণের শোচনীয় অবস্থার কথা অনেক সময় চিন্তা করিতেন।

বান্ধবীদের সহিত এবিষয়ে তাঁহার কথাবার্ত্তাও হইত। একদিন লেখা বলিলেন—আমাদের দেখ্‌ছি সেই লেকের কাছের সাহেব-মেমের মত বেপরোয়া না হইলে চলিতেছে না। এই বলিয়া লেখা যে কাহিনীটী বর্ণনা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সংস্কৃত রূপটী এই—এক গ্রীষ্মের রাত্রে আত্যধিক গরম বোধ হওয়ায় তাঁহারা লেকে বেড়াইতে গিয়াছেন; লেকের পশ্চিমতীরে একটী আম গাছের নিকটে একখানি বেঞ্চির উপরে শয়ন করিয়া তিনি শীতল বায়ু উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় আমগাছটীর অপর দিকে একজোড়া সাহেব মেমের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। উহারা শায়িত ছিল, লেখার সঙ্গীর সহিত কয়েকবার দৃষ্টি-বিনিময় হওয়া সত্ত্বেও লজ্জিত হইল না। এই ঘটনা ব্যক্ত করিয়া লেখা কহিলেন—ওরা আমাদের দেশীয়গণকে কুকুর-বিড়ালের সামিল মনে করে। শয্যাপার্শ্বে শায়িত বিড়ালকে যেমন আমরা লজ্জা করি না, উহারাও তেমনি আমাদের উপস্থিতিতে লজ্জিত হইল না। বাঙ্গালীর মনকে ওদেরি মত সবল কর্‌তে হবে, নিন্দুক পরশ্রীকাতরের দল তাহ'লে লজ্জায় আপনারাই পালাবার পথ পাবে না।

এই উপদেশ তাঁহারা অনেকটা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাহাকেও পরোয়া করিতেন না। যদি কেহ কোন কথা বলিত, তিনি মুখের উপরে শুনাইয়া দিতেন—আমার যা খুসী আমি করব। অবশেষে একদিন বন্ধুকে তিনি বলিলেন—আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল, এ বাড়ীর লোকগুলি ভয়ানক হিংসুটে হয়ে উঠেছে।

বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার সাধ্বী পূণ্যবতী স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীকে নাকি তিনি নিজের আচরণের কৈফিয়ৎ তলব করিবার

মত অধিকার দেন নাই। তাই লেখাকে নিজবাটীতে লইয়া যাইতে তিনি দ্বিধা করিতেন না—লেখা নিজেও সেখানে মাঝে মাঝে যাইতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাব্য চর্চ্চায় কাটাইতেন।

দুষ্ট লোকের নিন্দার ফলে ব্যাপার ক্রমে এতদূর গড়াইল যে সুশীল কুমারের মত সাংসারানভিজ্ঞ নির্ব্বিরোধ দার্শনিকেরও মনে বৃথাই চাঞ্চল্য ঘটিল। তিনি বাস করিতেন দার্শনিকতাব অত্যুচ্চ লোকে—শত নিন্দুক, সহস্র লেখা, এমন কি নীরদরঞ্জনেরও যেখানে প্রবেশাধিকার নাই। পুবানে আছে—গভীর রাত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি যখন বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া শাস্ত্রাধ্যযনে রত ছিলেন, একজন দাসী আসিবা তাঁহাকে মিথ্যা খবব দিয়াছিল যে তাঁহার শযন-কক্ষে বসিয়া চন্দ্র ও তাঁহার পত্নী প্রেমালাপ কবিতেছে। শাস্ত্রগন্থ হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন—"শয্যা বিছাইয়া দাও।" সুশীলকুমাবের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। এক একদিন তিনি যখন লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া নূতন কোন দার্শনিক-তত্ত্বের গবেষণার মগ্ন থাকিতেন তখন বাড়ীর কাহারও শিক্ষামত তাঁহাব ভৃত্য আসিয়া বলিত—"মা, কাকাবাবুব সঙ্গে বাহিরে যাচ্ছেন।" শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ড্রাইভারকে দেখে নিতে বল্ গাড়ীতে পেট্রল ভবা আছে কিনা!" লোকের নিন্দার জন্যও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নীবদ ও লেখার প্রতি তাঁহার ব্যবহারের কোন তারতম্য ঘটিত না।

কুলোকের প্ররোচনায় এই সুশীলকুমারকে একদিন স্ত্রীর নিকটে বলিতে হইল—'কেলেঙ্কারী বেশী দূর না গড়ায়!' স্ত্রী কিন্তু এ প্রকার মিথ্যা কথায় লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, বেশ নিঃসঙ্কোচেই জবাব দিলেন যে, যদি তাঁহার নিজের ইচ্ছা মত চলিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি সুশীল বাবুর সুবিধার জন্য গৃহত্যাগ

করিতেও প্রস্তুত। কেহই তাঁহাকে ঠকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া সুশীলবাবু সুখীই হইয়াছিলেন। বন্ধুকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে লইয়া সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর ঘর করিয়াছেন, সেই যদি মুখের উপর এমন অপ্রিয় সত্য বলিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে বন্ধু যে মিথ্যা দোষারোপের জন্য ওস্‌মান সাজিয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন না, তাহারই নিশ্চয়তা কি ?

মিথ্যা কলঙ্কের জন্য সুশীলবাবুর হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। দর্শন-শাস্ত্রের তথ্যজালের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রাখিলেও তিনি প্রণয়-তত্ত্ব ও পরকীয়া তত্ত্বের রসাস্বাদনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার হৃদয় জানে শুধু সেই একনিষ্ঠ প্রেম, যাহার স্রোত একটীবার একটী পথে মাত্র প্রবাহিত হয়। সেই সমর্পণের মুহূর্ত্তে আঠারো বৎসর আগেকার সেই শুভলগ্নটী, যে পথ শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত বিবাহের পথ। যে প্রগতিবলে বহু নরনারী সেই শুভলগ্নটীর মহিমা বিস্মৃত হইয়াছে, যে প্রগতি শাস্ত্রাচার ও লোকাচারকে তিনি তুড়িতে উড়াইয়া দিতে শিখাইয়াছে, সুশীল তখনও সে প্রগতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মনেপ্রাণে জানেন যে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত অবাধ মেলামিশা করিয়াও তাঁহার সুশীলা পত্নী তাঁহার দিকেই চাহিয়া থাকিবে—সূর্য্যমুখী পুষ্প যেমন চারিপার্শ্বে বাতাসে সুবাসরাশি ঢালিয়া দিয়াও একমাত্র দিবাকরেরই মুখ চাহিয়া থাকে অথবা রাজহংস যেমন পঙ্কিল ক্লেদে অবতরণ করিয়াও আপনার পালকগুলির দুগ্ধফেণ শুভ্রতা অটুট রাখে।

কেহ কেহ বলেন সুশীল এখানে ভুল করিয়াছিলেন। তিনি

এই চিরন্তন সত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে গৃহ যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে গৃহকে গৃহ করিয়াই রাখিতে হইবে। গৃহকে হাট-বাজারে পরিণত করিয়া তাহার গৃহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা চলে না। স্ত্রীকে পরপুরুষ-সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহার সঙ্গ-কামনাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার ফলে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িতে হইলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। মানুষের মন জড়বস্তু নহে যে তাহাকে যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিলেও তাহার বিকৃতি ঘটিবে না। আর জড়বস্তুর যখন চুরি যাইবার আশঙ্কা থাকে, তখন মানবচিত্তই বা সে আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইবে কি করিয়া ?

কিন্তু তিনি ভুল করে নাই, গৃহকে তো তিনি বাজারে পরিণত করেন নাই। স্ত্রীকে অবাধ স্বাধীনতা দিলেও সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল, পতিব্রতা স্ত্রীও স্বামীর প্রতি উদাসীন ছিলেন না।

হায়রে মানুষের মন! যে তাহাকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাকেও বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাহার কি দুরন্ত প্রয়াস! চোক্ষের উপরে যখন সে দেখে মৃত্যু তাহার পরমাত্মীয়কে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তখনও তাহার সহিত অসম্ভব সংগ্রামের দুঃসাধ্য বাসনা মনে জাগিয়া উঠে। সে জানে—মৃত্যুর কাছে ক্ষমা নাই, করুণা নাই, নালিশ নাই, প্রতিকার নাই, ভয়-প্রদর্শনে বা বল-প্রয়োগে ফল নাই, তথাপি তাহার মন প্রলুব্ধ হইা উঠে—যদি কোন মতে রাখিতে পারি! মৃত্যুর সহিত সংগ্রামেই যখন মানুষ নিরাশ হয় না, তখন পর-সঙ্গ-লিপ্সায় উদগ্র কামনা হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবার আশাই বা সে করিবে না কেন ?

সুশীলকুমার দর্শন-চর্চ্চা করিলেও প্রেম-চর্চ্চা করেন নাই। করিলে

বুঝিতে পারিতেন, কবির কথাই যথার্থ—মৃত্যু আর প্রেম একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। মৃত্যুর আহ্বান যাহার কানে পৌঁছিয়াছে, সেও যেমন এ বিশ্বসংসারের কাহারও পানে ফিরিয়া চাহে না, তেমনি প্রেমের বাঁশী যাহার হৃদয়-যমুনা উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে সেও লাজ-মান-ভয়, সংসার-সমাজ, নীতি-ধর্ম্ম-বিবেক সকল বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদেরই কণ্ঠালিঙ্গনসুখকে স্মরণ করিয়া সাগরাভিমুখে অভিসারিকা স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাহারই পানে ধাবিত হয়।

সদাশিব সুশীলকুমার পবিত্র প্রেমের এ গূঢ়তথ্য এ কূটতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন, তাই তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া পত্নীকে কহিলেন :—

"যাহা হইবার হইয়াছে। লোকের গঞ্জনায় যে বৃথা কলঙ্ক তোমায় দিয়াছি, আমি সে সব ভুলিয়া গিয়া তোমাকে ঠিক আগের মত সম্মানে রাখিতে প্রস্তুত আছি। তুমি নীরদের সঙ্গ ত্যাগ কর। তুমি বল ত্যাগ করিবে—তাহা হইলে ওকে বলিয়া দেই যে এ বাড়ীতে যেন না আসে। লোকে তোমাদের পবিত্র ভাবের কথা জানেনা, সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৃথা কলঙ্ক রটিবেই।

স্বামীর এহেন কাতোরোক্তিতেও কঠোরহৃদয়া সাধ্বী পত্নীর নিষ্পাপ হৃদয় বিগলিত হইল না। লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ভাবে পতিব্রতা সতী উত্তর করিলেন :—

"বৃথা নীরদকে কলঙ্ক দিয়া যদি এবাড়ীতে ঢুকিতে না দাও, তবে আমিই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।"

সুশীলবাবু আর কি করিবেন—

"আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া"

বলিয়া চণ্ডীদাসের বাঁধা আপশোষ করেন নাই। তাঁহার রাধিকা যে তাঁহারই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবন-বিলাসিনীর মত সুর ধরেন নাই—

"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈন পর ॥"

তাঁহার এ প্রকার দুঃখের কোন কাবণ ছিল না।

লোক গঞ্জনায় বাড়ীতে টিকিতে পারেন না। কলেজে গিয়াও মনকে সুস্থির করিতে পারেন না—যে স্ত্রী সর্ব্বদা অপরের চিন্তা করে না তাহাকে বহিয়া বেড়াইবার মত শক্তি তাঁহার আছে কিন্তু নিন্দার ভয়ে তিনিও দুর্ব্বল। মহর্ষি গৌতমকে কে বিদ্রুপ করিয়া বলিযাছিল, "আপনি ন্যায় শাস্ত্রের সূত্র বচনা করিতেছেন আর ইন্দ্র আপনারই গৃহে বসিয়া অন্যায়ের সূত্রজাল বুনিতেছেন।" রিপন কলেজের ক্লাশরুমে দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতা করিতে করিতে এই কথাটাই বারংবার বৃথাই সুশীলকুমারের মনে পড়িত। কেহ চাপা গলায় কথা কহিলে তাঁহার ভ্রম হইত—বুঝিবা কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে, হাসিলে মনে হইত তাঁহারই দুরদৃষ্টে আনন্দ উপভোগ কবিতেছে।

মনের কষ্ট অপেক্ষাও আর একটী জিনিষ তাঁহাব কাছে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—মিথ্যা কেলেঙ্কারী বাজারে প্রকাশিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা। প্রতিদিনই কলেজ হইতে ফিরিবার সময়ে তাঁহার মনে বৃথা আশঙ্কা জন্মিত—বাড়ী গিয়া হয়তো বা শুনিবেন,পাখী পালাইয়াছে।

ক্রমে এমন হইল যে কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া লেখা এক একদিন বহুরাত্রে বাড়ীতে ফিরিতেন। শ্রীযুত মৈত্র প্রমুখ তাঁহার দু'চারিজন আত্মীয় বন্ধুও লেখাকে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, কিন্তু পতিব্রতা লেখার সেই এককথা—"I have long been adult. I 'll see

my way with my own lenses. (আমি নাবালিকা নই ; নিজের চশমায় নিজের পথ চিন্‌তে পারব।)"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে স্রোতস্বিনী দুইকূল ভাঙ্গিয়া উদ্দাম গতিতে সিন্ধু সঙ্গমে ধাবিত হইয়াছে, তুচ্ছ উপলখণ্ডের বন্ধন কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে! একদিন আপনাব শয়ন কক্ষে বসিয়া লেখা কি একটা গান গাহিতেছেন। কান পাতিয়া অনেকেই গানটী শুনিতে লাগিলেন—

"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুবাই মনের সাধ
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটছে রোধিবে কে ?
নূতন তুফান উঠেছে—
নূতন তরী ভাসবে সুখে মাঝিতে হাল ধবেছে।"

"তাই যাও লেখা, তাই যাও ; এ বালির বাঁধ কিছুতেই তোমার যৌবন-তরঙ্গকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। মনের সাধ পুবাইয়া জোয়াব গাঙ্গেই ছুটিয়া যাও। যে নূতন তুফান তোমার দেহ-নদীকে আজ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, নূতন মাঝির চালনায় নূতন তরীই তাহাতে ভাসাইয়া দাও।"

বহু পুরাতন গানটীর পবিত্র ভাব ভুলিয়া গিয়া দুষ্ট লোক নিজের মনের ভাব লেখার প্রতি আবোপ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিল তাহা বুঝিলেন লেখা স্বয়ং ও ভগবান।

মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইল এই যে লেখাও তাঁহাকে মুক্তি দেয় না তিনিও লেখাকে মুক্তি দেন না। বুঝিলেন তাঁহারই গৃহে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বসিয়া এই সাহিত্য আলোচনা চলিতে থাকিবে ; লোক গঞ্জনায়

তিনি না পারিবেন ইহা সহ্য করিতে, না পারিবেন ইহাতে বাধা দিতে। কুঞ্জ সাজাইয়া কুসুম-শয্যা রচনা করিয়াই মানুষ শ্রান্ত অবসন্ন, সান্ত্বনাবিহীন দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারে না।

কিন্তু সুশীলকুমার দার্শনিক বলিয়া তো আর তাঁহার পরিবারস্থ অপর সকলে দার্শনিক নহেন। সুশীলকুমারের চিত্ত পাষাণে গঠিত, হিমাদ্রি তুল্য প্রশান্ত। কিন্তু তাই বলিয়া অপরের চিত্ত তো আর তাহা নহে। ঈর্ষা করিয়া সুশীলকুমারকে তাঁহারা শেষ কথা শুনাইয়া দিলেন—হয় তিনি পত্নীকে ত্যাগ করুন, নতুবা তাঁহাকে সংশোধন করিয়া লউন। অপর পুরুষ যখন তখন তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ীর বধূর সঙ্গে সঙ্গীতালাপ ও কাব্যালাপ করিবে—ইহা যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাড়ীর বধূও একাকী বা পর-পুরুষ সঙ্গে যখন তখন বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবে, গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরিবে—ইহাও অবাধে চলিতে দেওয়া যায় না। বাড়ীতে অন্যান্য বধূ ও কন্যা রহিয়াছেন। এহেন স্বেচ্ছাচারিতা বাড়ীতে বসিয়া চলিতে থাকিলে, বাড়ীর নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং এসম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য······ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বৃথা কলঙ্কে সুশীলকুমারের ও বন্ধু নীরদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। কেবল বাড়ীর লোকই নহে। এই সুযোগে অনেকেই সুশীলকে লাঞ্ছিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। যুক্তি দ্বারা তো মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচান যায় না। দু'একজন প্রবীণ সুশীলকুমারকে ভাবে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে ব্যাপারটা ভাল হইতেছে না। বন্ধুদের অনুরোধে অগত্যা সুশীলকুমার দম্‌দমে এক নির্জ্জন বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া স্ত্রীকে সেখানে স্থানান্তরিত করিলেন।

নীরদরঞ্জন প্রথম কয়েকদিন লেখার নূতন বাসস্থানের সংবাদ জানেন নাই। কলিকাতার বাসায় টেলিফোন ছিল; লেখা প্রয়োজন মত যখন তখন টেলিফোন করিয়া নীরদকে আনাইতেন। দমদমের বাগান বাড়ীতে টেলিফোন নাই—নিস্কলঙ্ক চরিত্র লেখা একদিন হাঁটিয়া দমদম ষ্টেশনে গেলেন। সেখান হইতে একটী ট্যাক্সি যোগাড় কবিযা কলিকাতায় আসিয়া বান্ধব বান্ধবীর সহিত মিলিত হইলেন। সুশীলকুমার কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন লেখা বাড়ীতে নাই। বাড়ীর চাকর তাঁহাকে জানাইল যে তাহাদের প্রভুপত্নী পায়ে হাঁটিয়া কোথায চলিয়া গিয়াছেন। সুশীলকুমার অপবেব কথায় মনে করিলেন—লেখা আর ফিরিবেন না। কিন্তু রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়ে একাকিনী লেখা ট্যাক্সিতে বাগানে ফিরিলেন। এরূপক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ গ্রহণের প্রয়োজন সুশীলকুমার অনেক আগেই ছাড়িয়াছেন, আজও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পরদিন দুপুরবেলা নীরদরঞ্জন আসিয়া হাজির হইলেন। ইহার পরে প্রায়প্রতিদিন দুপুরেই তিনি দম্‌দমায় সেটেলমেণ্টের মোকদ্দমার জন্য আসিতেন এবং মোকদ্দমার পরে লেখার সহিত সাহিত্য ও আর্টের আলোচনা করিতেন। যে প্রেমে প্রেমিক শবদেহ আশ্রয় করিয়া নদী পার হইতে পারে, দড়ি মনে করিয়া বিষধর সাপ জড়াইয়া ধরিতে পারে লেখাও নীবদবঞ্জনের অন্তরে সেই প্রেম নহে। বন্ধুর সহিত বন্ধুপত্নীর পবিত্র প্রেম, আবিলতাহীন নিষ্কাম প্রেম। দম্‌দম্‌ তো সহজ ও সুগম পথ মাত্র!

সুশীলবাবু সবই দেখিতেন, সবই জানিতেন। একমাত্র মিথ্যা গঞ্জনার জন্য ঘৃণায়, লজ্জায়, তীব্র অন্তর বেদনায় জীবন্মৃত হইয়া কখনও তিনি বসিয়া বসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেন; কখনও বা বহু চেষ্টায়

দর্শন-চর্চ্চায় নিমজ্জিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি আনয়নে সমর্থ হইতেন। নিন্দুকের কথায় মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া কত লোক খুন করিয়া ফাঁসী কাষ্টকে আলিঙ্গন করে, মদ খাইয়া বা জুয়া খেলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া লয়, অথবা আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করে। সুশীলবাবুর ন্যায় চিত্তপ্রশান্তির পরিচয় দিতে কয়জন পারে। সত্য হৌক আর মিথ্যা হৌক, ভুলেও যিনি মনে করেন যে, তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত, তাঁহার মত গ্লানিকর জীবন আব কাহারও নাই। রোম-সম্রাট নীরোর ন্যায় ঘোর ব্যাভিচারীও স্বীয় ব্যাভিচারিণী পত্নীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই—সুশীলবাবু তো ধার্ম্মিক, সদাশয়, সৎ—চরিত্রবান-গণের আদর্শ, স্ত্রীও সুশীলা সচ্চরিত্রা তাই লোকের অপবাদে নিজের পাপের বোঝা না বাড়াইয়া তিনি রিপন-কলেজে দর্শন পডাইয়া, বাড়ীতে দর্শন-চর্চ্চা করিয়া গৃহের অশান্তি ভুলিবার চেষ্টা করিলেন।

এমনভাবে কিছুদিন কাটিবার পর লেখার সুমতি হইল; স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে মুক্তি দিলেন।

লেখা একাই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; ট্যাক্সি ড্রাইভার ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে কেহ ছিল না। নীরদরঞ্জন তাঁহাকে গৃহত্যাগের জন্য অনুরোধও করেন নাই, করিলে লেখার গৃহত্যাগে এত বিলম্ব ঘটিত না; সুশীলকুমারকেও দম্‌দমার বাগানে আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতে হইত না।

নির্ম্মলচরিত্র আইনজ্ঞ নীরদরঞ্জন বন্ধুপত্নীকে অসদুদ্দেশ্যে কুলের বাহির হইবার সাহায্যও করিতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য দয়াপরবশ হইয়াই পরে লেখাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাই জনরব।

লেখার এই যে গৃহত্যাগ, ইহা সাধারণ নারীর গৃহত্যাগ নহে। নৈশ

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চুপি চুপি তিনি স্বামী-গৃহ হইতে বহির্গত হ'ন নাই—প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ীর দারোয়ান ও ভৃত্যগণের উপস্থিতিতে, কিশোর বয়স্ক পুত্রের সম্মুখে সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুলললনার সর্ব্বজনমান্য কৃতী ও বিদ্বান স্বামীর বিবাহিতা-পত্নীর অষ্টাদশ বর্ষ বিবাহিত জীবন যাপনের পরে এই গৃহত্যাগ কেবল প্রগতির যুগেই সম্ভব। এইজন্যই এই আখ্যায়িকার আরম্ভে বলিয়াছিলাম যে, গতি যেখানে লক্ষ্যপথ ছাড়াইয়া অনির্দ্দেশ্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাই হইয়া দাঁড়ায় প্রগতি।

বাড়ী আসিয়া সুশীলকুমার সব শুনিলেন। লেখার অপরিহার্য্য সঙ্গ পরিহার করিবার জন্য তিনি কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। কিন্তু তথাপি এ সংবাদ শ্রবণে উল্লসিত হইতে পারিলেন কৈ ? যে জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপিয়া বসিয়া তাঁহার বক্ষ নিষ্পেষিত করিয়া তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, সে পাষাণ আপনা হইতেই নামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার বুক হালকা হইল কই ?

লেখার জন্য তিনি অনেক সহিয়াছিলেন ; লেখারই মুখ চাহিয়া তিনি স্বজনবর্গের নিকট হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, লেখা ব্যথিত হইবে বলিয়া তিনি সচ্চরিত্র বন্ধুকে পর্য্যন্ত বাড়ী আসিতে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইদানীং নীরদ যখন দম্‌দমার বাগান-বাড়ীতে আসিত, নীরদ ও লেখাকে রাখিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতেন—নীরদ চলিয়া গেলে গভীর রাত্রে ফিরিতেন। উহাদের নির্ম্মল অনাবিল আনন্দের প্রতিবাদী হইতেন না।

আজ তাঁহার কত কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। মনের পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সেই আঠারো বৎসর পূর্ব্বের কথা—প্রথম মিলন-রাত্রির কথা, বিবাহিত জীবনের স্বপ্নময় সুখময় প্রথম বৎসরগুলির

কথা। আহা! লেখার প্রথম যৌবনের প্রেমের অর্ঘ্য পাইয়া একদিন তিনি ধন্য হইয়াছিলেন, জীবন সার্থক বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কি লেখার সে যৌবন আছে না রূপ আছে, না সে প্রাণঢালা প্রেমই আছে!

নীরদরঞ্জনকে তিনি এজন্য মনে মনেও অভিযুক্ত করিতে পারিলেন না। বন্ধুপত্নীর প্রতি বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য, নীরদ তাহাই করিয়াছেন—নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়াছেন। কেহ না জানিলেও সুশীলকুমার তো জানেন নীরদরঞ্জন অকলঙ্ক চরিত্র, নির্ম্মলস্বভাব! যাহার সহিত তিনি আঠারো বৎসর ঘর করিয়াছেন, সেই যখন দাম্পত্যজীবনের অবমাননা করিয়া নীরদের কণ্ঠালিঙ্গন জন্য বাহুপ্রসারণ করিয়া দিল, তখন সেই উদ্‌গতহৃদয়া নারীর প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করা ছাড়া নীরদের কি উপায় ছিল? লেখাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি হয়তো অধিক শোচনীয় পরিণামে লিপ্ত হইতে দেন নাই, ইহাতে নীরদরঞ্জনের মহত্ত্বই সূচিত হয় কিনা পাঠক-পাঠিকাগণই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতে লাগিল, আপনারই নির্ব্বুদ্ধিতার কথা। সাহেবী বন্ধুত্বের বিভ্রমে যদি তিনি অতটা প্রশ্রয় না দিতেন, যদি গোড়া হইতেই সতর্ক হইতেন, তাহা হইলেও হয়তো সবদিক্ রক্ষা পাইত। মনে পড়িতেছে আর একটী পুরাতন কাহিনী—কাহিনীর নায়ক এক দর্শনাধ্যাপক, নায়িকা তাঁহার শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী—প্রতি-নায়ক এক বিলাত-ফেরৎ ব্যারীষ্টার। অধ্যাপকের স্ত্রীর সহিত ব্যারিষ্টারের প্রেমচর্চ্চা অধ্যাপকের গৃহের একটী পড়ুয়া ছাত্রের চ'ক্ষে বিসদৃশ ঠেকিল। ছাত্রটি দারোয়ানকে বলিয়া দিল সে যেন ব্যারীষ্টারকে অধ্যাপকের অনুপস্থিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেয়। শুনিয়া অধ্যাপক-পত্নী ছাত্রটীর উপরে চটিয়া গেলেন; স্বামীকে বলিলেন—

আমি যখন বাথ্‌রুমে ছিলাম, ও উঁকি দিয়াছিল। উহাকে তাড়াইয়া দাও। শুনিয়া অধ্যাপক ছাত্রটীকে কেবল বাড়ী হইতেই তাড়াইয়া দেন নাই, কলেজ হইতেও বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সুশীলবাবুর চিত্ত আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল; তিনি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—কি মূর্খ, কি মূর্খ তারা, যারা ব্যাভিচারিণী পত্নীর কথায় বিশ্বাস করে, ব্যাভিচারিণীকে প্রশ্রয় দেয়!

অবশেষে একদিন তিনি কাগজে পড়িলেন—লেখা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই আবাদ সংবাদ পাইলেন, লেখার সহিত নীরদরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। চিরপ্রশান্ত লোকটীর চিত্তে এইবারে চাঞ্চল্য ঘটিল, দ্বিতীয়বাব বিবাহ করিয়া লেখার শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য তিনি কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। অল্প অনুসন্ধানেই পাত্রী জুটিয়া গেল। ঢাকা ইডেন গার্লস্‌ স্কুলের অঙ্কশাস্ত্রেব অধ্যাপক শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা দত্ত এম্‌ এ, বি টী'কে তিনি বিবাহ করিলেন। স্নিগ্ধপ্রভা অঙ্কশাস্ত্রে ফার্ষ্টক্লাস এম্‌ এ; শুনা যায় বিধবা, সঠিক জানা যায় নাই। প্রভা ও দীপ্তিতে সুশীলকুমারের আতঙ্ক জন্মিয়াছে, স্নিগ্ধপ্রভার স্নিগ্ধতায় শীতল হইতে পারিলে তাঁহার বিদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে; উত্তরজীবনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাঁচিবেন। ভগবান তাঁহাকে সেই সোয়াস্তিটুকু দান করুন।

কিন্তু তাঁহার শিকলী-কাটা টিয়াটী ব্যারিষ্টারী বৃক্ষশাখায় নীড় বাঁধিয়া কিরূপে কালাতিপাত করিতেছেন, সে খবর সুশীলকুমার আর ল'ন নাই। লইতে প্রবৃত্তিও বোধ করি হয় নাই। পাখীই যদি খাঁচার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে, তবে খাঁচা পাখীর মায়া ত্যাগ করিতে পারিবে না কেন? নদীর ভাঙ্গনে যে কূল ভাঙ্গিয়া যায়,

তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া মরিলে নদীতীরের লাভ নাই; তাহার কাজ যতক্ষণ না সে একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে--শুধু ফাটল ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করা। সুশীলকুমার যে তাহা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি যে আপনার কর্ত্তব্য সর্ব্বংসহা বসুন্ধরারই মত ধীর ও স্থিব ভাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। দেবগুরু বৃহস্পতিকে আমরা দেখি নাই, ন্যায়শাস্ত্রেব সূত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গৌতমও আমাদের প্রত্যক্ষ-দর্শনের অগোচর, কিন্তু ডাঃ সুশীল মিত্রের যে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও মানসিক শক্তির পবিচয আমবা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সাধাবণের চিত্ত তাঁহাব প্রতি চিরশ্রদ্ধাবনত থাকিবে। আমাদেব মনে হয়, গুর্জ্জর-রাজ করুণসিংহ ও বঙ্গেব পাঠান শাসনকর্ত্তা শের খাঁ সুশীলকুমাব অপেক্ষা ভাগ্যবান ছিলেন—স্বীয় মহিষী কমলা দেবী ও মেহেরুন্নিসাকে পরস্ত্রী-গ্রহণকারী আলাউদ্দীন খিলিজি ও জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহেব অঙ্ক-শায়িনী দেখিবার পূর্ব্বেই তাঁহাবা গুপ্ত-ঘাতক হস্তে নিহত হইযাছিলেন, স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীদের অপবেব অঙ্কশায়িনী—অপরেব শয্যাভাগিনী দেখিবার দুর্ব্বিসহ জ্বালা অনুভব করিতে তাঁহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই। হ্যাম্‌লেট-জনকও অনুরূপ ভাগ্যে ভাগ্যবান।

সুশীলকুমারেব মহতী চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে স্ত্রীর সতীত্ব নীলামে চড়াইয়া ক্ষতিপূবণ দাবী করিতে যান নাই। করিলে চৌষট্টি হাজার টাকা না হৌক বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ডিক্রী কেন না লাভ কিরিতেন! অবশ্য সেরূপ করিলে পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম এক কাফেব রমণীকে কয়েকঘণ্টা বা কয়েকদিনের জন্যও "ইছলাম ধর্ম্মেব সুশীতল আশ্রয়ে" অবস্থিতির গৌরব-দান রূপ মহান 'সোয়াব' হইতে বঞ্চিত হইত। দুইটী মিলনোৎসুক্ বিধর্ম্মীকে

লাইসেন্স-বিহীন মিলনের পরিবর্ত্তে লাইসেন্স-যুক্ত মিলনের সুযোগ প্রদান করিয়া কয়েকজন মোল্লা ও শহীদ পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে সক্ষম হইতেন না।

কি ভাবে কোন্ ধর্ম্মমতে কোন্ কোন্ শাস্ত্রাচার ও লোকাচার পালন পূর্ব্বক নীরদরঞ্জন ও লেখা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সে মিলনে কে মোল্লার, আচার্য্যের বা পুরোহিতের কাজ করিয়াছিল, ব্যারীষ্টারকে তাঁহার দাঁড়কাকের পোষাক ছাড়িয়া চোগা-চাপকান, ধুতি চাদর কি চেলীর জোড় পরিধান করিতে হইয়াছিল,—অধ্যাপক-পত্নীর কলঙ্ক-শ্বাপদ-চিহ্নাঙ্কিত ললাট আবৃত করিতে বোরখা কি সিঁথি-মৌড় ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্বারা পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। নবমোলাকাতেই হৌক, কি হানি-মুনেই হৌক, কি ফুলশয্যার রাত্রিতেই হৌক বৈধাভিসারে নব-স্বামী-শয্যায় শয়ন করিয়া বহু-জানিত কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া লেখার কি একবার তাহাব কিশোরবয়স্ক পুত্রকেও মনে পড়ে নাই, মাতার শোচনীয় পরিণতি যাহার কিশোর-চিত্তেও ধিক্কার জন্মাইয়া দিয়াছে। নীরদরঞ্জন নিশ্চয়ই ওয়াটারলু-বিজয়ী মহাবীরের ন্যায় বন্ধু-গৃহ-পরিণামের গর্ব্বে আত্মহারা হন নাই, লেখার ইজ্জত রক্ষার জন্যই প্রথম স্ত্রীর সহিত প্রথম-মিলনের মধুরাত্রিটী বিস্মৃত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু যে সানন্দ ও স্বেচ্ছালব্ধ মহামিলনের ফলে লেখা তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ-প্রাপ্তি প্রথম সন্তানটী লাভ করিয়াছিল, সেই মিলন-রাত্রির স্মৃতি-তরঙ্গ কি লেখার অন্তরে এতটুকু কম্পনও আনয়ন করে নাই? অথবা আকাঙ্ক্ষিত রাজ-বিধি-অনুমোদিত প্রিয়-মিলন-সম্ভোগে প্রমত্তা নারী নব-ফসলের স্বপ্নে বিভোর হইয়া অতীতের স্বহস্ত-উন্মূলিত প্রাণরাগে অনুরঞ্জিত পুষ্পবিতানকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল?

কিংবা ইহাও আমাদের ভ্রম বা মানসিক বিকৃতি। লেখার (আর লেখা নাম কেন উচ্চাচরণ করিতেছি, দাস্য-প্লাবনে মিত্র-চিত্ত হইতে লেখা নাম ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে) দাস-গেহ-ভাগিনীর ন্যায় নারীবাই হয়তো মাতৃত্বকে আত্মসুখোপভোগের অন্তরায়ই মনে করে। হ্যাভলক্, এলিস, মেবী ষ্টোপসেব জন্ম-শাসন-বিধান হয়তো ইহাদেরই জন্য, সন্তান গর্ভে আসিবাব পূর্ব্বেই হয়তো ইহারাই নির্ম্মম ভ্রূভঙ্গীতে শাসন পূর্ব্বক তাহাদের আগমন-সম্ভাবনা তিরোহিত করে! যৌবন হয়তো ইহাদের পুষ্প-পরাগেই মুকুলিত হয়, ফলভারে অবনত হইতে না দিযা পরাগেব সৌন্দর্য্য-সৌরভ রক্ষণেই ইহারা সচেষ্ট হয়। যৌবনরসে উচ্ছ্বলিত বক্ষকে পীযুষ সুরভীব পরিবর্ত্তে এই শ্রেণীর যৌবন-বিলাসিনীবা হয়তো বাসনা-বিচ্ছুরিত চঞ্চল শোণিত-রাগেই ভরিয়া বাখে। কিন্তু হায! ইহারা কি একবারও ভাবে না যে জড়-বিজ্ঞানের সকল প্রভাব বিদূরিত করিয়া দিয়া জরা একদিন শাসনদণ্ড লইয়া তাহাদিগকে অমোঘ শক্তিতে তাড়না করিবে—সেদিন শেষ-সান্ত্বনা-দানের জন্য জীবনেব শেষ সম্বল ও লোকান্তর-পথের পাথেয় কোন ভবিষ্যদ্বংশধর সুশীতল স্পর্শে তাহাদের শূন্যতা জর্জ্জব বক্ষ-মরুর সন্তাপ নাশে অগ্রসব হইবে না।

লালবিহারী মজুমদার+সুহাসিনী রায়

যে অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী এইবাবে আমবা পাঠকগণকে উপহাব দিব, তাহাব সংযোগস্থল ঢাকা জিলাব নাবাযণগঞ্জ মহকুমায। এই আখ্যাযিকাব নাযক ঢাকাব জমীদাব—বিত্তসম্পত্তিতে না হইলেও বংশ মর্য্যাদায বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, আপনাব জমীদাবীতে ও জমীদাবীব বাহিবে তাঁহাদেব বংশেব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা।

কয়েক বৎসব পূর্ব্বে এক বিশিষ্ট পবিবাবস্থ সুভাষিণী নাম্নী একটী বালিকাব সহিত লালবিহাবীব বিবাহ হয়। বিবাহেব সময়ে লালবিহাবীব বযক্রম ত্রিশ বৎসবেব অধিক হইযাছিল, কিন্তু বধূ সুভাযিণীব বযস ছিল মাত্র ১১ বৎসব। ত্রিশ বৎসব বযসেব পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন ব্যক্তি একাদশ বৎসব বযস্কা অস্ফুটিভিন্নযৌবনা বালিকা পত্নী লাভে হযত সুখী হইতে পাবে না, যদি না প্রথম যৌবনেই সে শুকদেবেব ন্যায ব্রহ্মচর্য্যব্রতী হয। লালবিহাবী যে একপ ব্রহ্মচাবী ছিলেন না ইহা নিশ্চিত, তথাপি তিনি অতি যত্নে দৈহিক পবিত্রতা বক্ষা কবিযা আসিয়াছিলেন।

বিবাহেব পূর্ব্ব হইতে লালবিহাবী স্বীয় জমীদাবীব বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য ববগুণাব নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে নিজেদেব কাছাবী বাড়ীতে বাস কবিতেন। বিবাহেব পবে বালিকা পত্নীকে পিত্রালযে পাঠাইয়া সেখানে আসিয়া বাস কবিতে থাকেন। এই সময়ে ঐ কাছাবীতে একটী মুহুবীব পদ খালি হয়। লালবিহাবীব জ্যেষ্ঠ ভায়বা বেকাব অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, শাশুড়ীব অনুবোধে লালবিহারী

ভায়রাকে আনিয়া ঐ পদটীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই ভদ্রলোকও অল্পদিনের মধ্যে বিষয়কর্ম্মে নিপুণতা দেখাইয়া সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঐ কাছারীতে মাস ছয়েক কাজ করিবার পরে লালবিহারীর ভায়রা স্বীয় স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়া লইলেন। লালবিহারীর জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার নাম শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী—ইনিই আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়িকা। সুহাসিনী তাহার কনিষ্ঠা লালবিহারীর পত্নী সুভাষিণী অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়, বাসাবাটীতে আসিবার সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর।

সুহাসিনী যেমন রূপসী, তেমনি গুণবতী। সে যখন দেখিল—তাহার স্বামীর আশ্রয়দাতা লালবিহারীর পাঁচক ঠাকুরের রান্না কদর্য্য, আহার্য্য খাইতে কষ্ট হইতেছে, তখন সে বলিয়া কহিয়া নিজের বাসায় কনিষ্ঠ ভগ্নীপতির আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কাছারী বাটীর একটী কোণে তক্তপোষ বিছাইয়া ভগ্নীপতি নির্ব্বান্ধবের মত অবস্থান করিবেন, ইহা তাহার ভাল লাগিল না। ভগ্নীপতির নিকট টাকা লইয়া সে নিজের বাসার সীমানা মধ্যেই পৃথক্ একখানি খড়ের ঘর তুলিয়া লইল। লালবিহারী ঐ ঘরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রূপসী ও গুণবতী শ্যালিকার স্নেহে-যত্নে লালবিহারীর আর কোন অভাব রহিল না।

কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডান না যায়; বৎসর দুই যাইতে না যাইতেই সুহাসিনীর স্বামী কয়েকদিবসের জ্বরে ভবসমুদ্রে পাড়ি জমাইলেন। নিঃসন্তানা ভরা-যুবতী স্ত্রীর কি দশা হইবে, কোথায় সে আশ্রয় পাইবে, সে সকল ভাবনা ভাবিবার পর্য্যন্ত অবসর পাইলেন না।

বিধবা সুহাসিনীকে তাহার ভ্রাতা আসিয়া পিত্রালয়ে লইয়া গেল। তাহার স্বামী-গৃহের অবস্থা ভাল ছিল না, সে পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিল।

ইহার পরে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, লাল-বিহারীর পত্নীর বয়স সতেরো আঠারো হইয়াছে। তাহাকে তিনি নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন।

সুভাষিণী অন্তঃসত্ত্বা। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ঘর-সংসারের কাজ চালাইবার জন্য বাসায় দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের দরকার। লালবিহারীর মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ নানাকারণে দেশের বাটী ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, অথচ অনাত্মীয় কোন স্ত্রীলোকের দ্বারাও ইহা সম্ভব নহে। তাই লালবিহারী নিজে শ্বশুরালয়ে গিয়া বিধবা শ্যালিকা সুহাসিনীকে লইয়া আসিলেন। যে বাসাবাটী হইতে সদ্যঃবিধবার বেশে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছিলেন, কনিষ্ঠা ভগ্নীর ও ভগ্নীপতির সাহায্যার্থে কয়েকবৎসর পরে সুহাসিনী সেই বাসা-বাটীতেই পুনরায় প্রবেশ করিলেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, যাইবার সময়ে ছিল তাহার ভোগবঞ্চিত প্রস্ফুট যৌবন আর তখন সর্ব্ববিধ ভোগ-সাধ অন্তর দূর করিয়া সে নূতন করিয়া নিজেকে গঠন করিয়া লইয়াছে।

সুহাসিনী সংসারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল। ভগ্নীর শুশ্রূষার সহিত ভগ্নীপতির সর্ব্ববিধ সাচ্ছন্দ্যবিধানও হইল তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম। ফলে দাঁড়াইল এই যে কনিষ্ঠা ভগ্নী যখন নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে একটী কন্যা-সন্তান প্রসব করিল, জ্যেষ্ঠা সহোদরার তখন কনিষ্ঠারই অনু-গামিনী হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। সুভাষিণী সরলা নারী, দিদির সহিত স্বামীর মাখামাখি তাহার নিকটে কিছু আতিশয্যের লক্ষণ বলিয়া বোধ হইলেও গৃহে নূতন অতিথির আগমনসম্ভাবনার কথা

তাহার কল্পনারও অতীত হইয়া রহিল। দুইমাসের শিশুসন্তান সহ লালবিহারী যখন দেশস্থ বাটীতে যাত্রার জন্য আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহাকে নৌকায় তুলিয়া দিলেন, তখন সে দিদির হাতখানি ধরিয়া মিনতির সহিত বলিল—"ওঁকে দেখা দিদি, ওঁর যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

দিদি হাসিয়া বলিলেন—"নারে খুকী, ওঁর কোন অসুবিধা হবে না, ওঁর যা যা অভাব সবই আমি পূরণ কর্‌ব।"

ইহাব মাসখানেক পড়ে লালবিহারী শাশুড়ীর কাছে চিঠিতে লিখিলেন যে তিনি কাশী ও বৃন্দাবন বেড়াইয়া আসিবেন স্থির করিয়াছেন। সুহাসিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহে; যদি শাশুড়ীর আপত্তি না থাকে তবে তাঁহাকেও তীর্থ করাইয়া আনিতে পারেন। সুভাষিণী এই সময়ে পিত্রালয়ে ছিল, স্বামীর এই প্রস্তাবে তাহার মনে খট্‌কা লাগিল। তখন দিদির সহিত স্বামীর ঘনিষ্ঠতা—অনেক দিনের অনেক ছোটখাট ব্যাপার তাহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু হাজার হৌক্ নিজেরই জ্যেষ্ঠা ভগিনী—সঠিক কিছু না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণা করা চলে না। তাই সে চুপ্ করিয়া রহিল। মা যখন বলিলেন, "ভালই হ'ল সুভি, শোকে তাপে মেয়েটা আধখানা হয়ে গেছে, তীর্থধর্ম্ম করে যদি একটু শান্তি পায়! আর এতো পরের সঙ্গে নয়, জামাই আমাদের মহাদেবের মতো মানুষ! বিধবা শালীর জন্য অতখানি কর্‌তে কে রাজী হয়? কি বলিস্ খুকী, লিখে দেই? তখন সে কহিল—"দাও।"

সুহাসিনীকে লইয়া লালবিহারী কলিকাতায় আসিলেন। রওয়ানা হইবার পথে যখন তাঁহারা সুহাসিনীর স্বামীর শ্মশানের সম্মুখ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন তখন লালবিহারী সুহাসিনীর মাথাটা

ঝাকাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"নাও, এইখানে শেষবার প্রণাম করে নাও। শীগ্‌গীরই আবার নূতন পায়ে প্রণাম কর্‌তে হবে।" সুহাসিনী হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

কালীঘাটে ছোট একটী বাসা ভাড়া করিয়া দিনকতক তাঁহারা সেখানে রহিলেন। তারপর লালবিহারী সুহাসিনীকে বলিলেন,—"দেখ, এই অবস্থায় কাশী যাওয়া ভালো হবে না। তোমার অবস্থাটা তো আর চেপে রাখার মত কিছু নয়, লোকে দেখে হাস্‌বে।" সুহাসিনী কহিল—"কেন, বেশ বদ্‌লে নিলেই হলো। শাড়ীটে না হয় বাক্স থেকে নামানো যাবে।" এইস্থলে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে স্ত্রী দেশে যাওযাব পবেই লালবিহারী সুহাসিনীর জন্য জড়ি পাড়ের ভাল দু'খানি শাড়ী কিনিয়াছেন—দু'দিন মাত্র সন্ধ্যায দবজা বন্ধ করিয়া সুহাসিনী তাহা পড়িয়াছিল; লালবিহারী একাই তাহা দেখিয়াছিলেন। এখন সুহাসিনীর কথায় লালবিহারী বলিলেন—"কাশীতে গিয়ে মিথ্যা-চরণ কর্‌লে নরকে পচে মর্‌তে হয় তা জান?" সুহাসিনী কহিলেন—"তাহ'লে কাশী যাওয়ার আগেই সত্যাচরণের উপায় কর্‌তে হয়!" লালবিহারী কহিলেন—"আমিও সেই কথাই ভাব্‌ছি। চল আমরা নবদ্বীপ যাই, কোন বৈষ্ণবদাস বাবাজীর আখ্‌ড়ায় উঠে কণ্ঠি-বদল করা যাবে।"

যে কথা, সেই কাজ। সুহাসিনীকে লইয়া লালবিহারী নবদ্বীপেই গেলেন। যথারীতি কণ্ঠী-বদল করিয়া লালবিহারী সুহাসিনীকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নবদ্বীপ হইতে সুহাসিনী শান্তিপুরে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের কোন কোন পরিচিত ব্যক্তি সেখানে থাকায় লালবিহারী রাজী হ'ন নাই। অবশ্য সুহাসিনী অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন

—"এ তোমার অন্যায় পক্ষপাত, খুকীর বেলা নিশ্চয়ই আপত্তি কর্‌তে না।"

যাহা হোক্ নবদ্বীপ হইতে সোজাসুজি তাঁহারা কাশীতে গেলেন। নবজাত শিশুকে বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ে রাখিয়া সুহাসিনী গলবস্ত্রে জানাইল—"বাবা বিশ্বেশ্বর, অভাগিনীকেএই সৌভাগ্যটুকু যে দেবে, এ ছিল স্বপ্নের অগোচর। যদি দিয়েছই প্রভু, তাহ'লে এ সৌভাগ্য বজায় রেখো। অভাগিনীর অদৃষ্টের ফেরে আবার সব ছাই হয়ে না যায়।"

কাশী হইতে ইহারা বৃন্দাবন গেল, বৃন্দাবন হইতে মথুরায়। অবশেষে মাস ছয়েক পরে যখন সেই কাছারীর বাসায় ফিরিল, তখন সুহাসিনীর সধবা বেশ দেখিয়া ও তাহার কোলে ছেলে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। সধবার চিহ্ন অবশ্য তাহার বেশভূষাতেই শুধু ছিল, নহিলে হাতেও সে শাঁখা পড়ে নাই—কপালেও সিঁদুর দেয় নাই। লালবিহারী নাকি তাহাকে এই দুইটী জিনিষ গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-ই রাজী হয় নাই। নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব বাবাজী তাহাদের কণ্ঠীবদল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনিই সুহাসিনীকে শাঁখা-সিঁদুব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ মা, শাঁখা-সিঁদুর কখনও প'রো না। বৈষ্ণবীর পক্ষে শাঁখা-সিঁদুর নেহাৎ নিসিদ্ধ না হ'লেও একান্ত আবশ্যকও নয়। অথচ ওতে পদে পদে অসুবিধা।" বুদ্ধিমতী সুহাসিনী বাবাজীর কথার মর্ম্ম মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাই লালবিহারীর একান্ত অনুরোধেও শাঁখা-সিঁদুর গ্রহণ করেন নাই।

লালবিহারী কাছারীর মালিক, তাই সব কথা বুঝিলেও তাহার আচরণের প্রতিবাদ করিতে কর্ম্মচারীরা কেহ সাহস পান নাই। প্রভুকে

তাহারা পূর্ব্ববৎ সম্মান করিয়া চলিলেন, কেবল প্রভু-রমণীর সংসর্গ হইতে নিজ নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সতর্কতার সহিত দূরে রাখিলেন।

এ সকল কথা লালবিহারীর বাড়ীতে গিয়া পৌছিতে দেরী হয় নাই; গোমস্তা-মুহুরীদের মধ্যে কেহ কেহ লালবিহারীর স্বগ্রামবাসী ছিলেন, তাঁহারা গিয়া সালঙ্কারে ঘটনাটী গ্রামময় প্রচার করিয়া দিলেন। লালবিহারীর মাতা পুত্রকে বাড়ীতে আসিয়া থাকিবাব জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিলেন। লালবিহারীর কনিষ্ঠ সহোদরও চিঠিতে দাদাকে দেশের বাড়ীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী সুভাষিনী একটীবার বাড়ী আসিয়া দেখা করিবাব জন্য চিঠিতে শত অনুবোধ জানাইল। কিন্তু না আসিলেন লালবিহারী নিজে, না আসিল চিঠিপত্র। অবশেষে লালবিহাবীর মা ও শাশুড়ী পরামর্শ কবিয়া সুহাসিনীর শ্বশুর-বাড়ীর নিকটস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ গিয়া জানাইল যে সুহাসিনীর শাশুড়ী মৃত্যু-শয্যায়, তিনি বধু-মাতাকে শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু লালবিহারীর চক্রান্তে সুহাসিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই ঘটিল না। অবশেষে সুভাষিনীর একান্ত কাতরতায় তাহার মা নিজেই গেলেন সুহাসিনীকে লইয়া আসিতে। আগেই খবর পাইয়া লালবিহারী সুহাসিনীকে সরাইয়া ফেলিলেন। শাশুড়ীকে কহিলেন—"আমি তাকে নবদ্বীপ নিয়ে বিয়ে করেছি। সে এখানে সুখেই আছে। আপনি কেবল একমেয়ের সুখের দিকেই চাইবেন না, বড়মেয়েও আপনারই মেয়ে—সে যদি ছেলে-পুলের মা হয়ে মাছভাত খেয়ে থাকৃতে পারে, তাতে আপনার খুসী হওয়াই উচিত।" শাশুড়ী যখন বলিলেন—"এমন করে আমাদের পর ক'রে দিও না বাবা," তখন লালবিহারী আবার বলিলেন "আপনাদের

কি আমি পর কর্‌তে পারি, বরং একটী সম্পর্কের জায়গায় দু'টী সম্পর্ক পাতিয়ে আরও আপনার হ'য়ে গেলাম।" তিনি একটীবার মেয়েব সহিত দেখা করিতে চাহিলে লালবিহারী আবার বলিলেন—"আপনি যেদিন তাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ কর্‌তে পারবেন, সেদিনই সে আপনার সঙ্গে দেখ কর্‌বে। তবে আপনি যদি চান, নাতিটীকে দেখে যেতে পাবেন। আমি জোর করে বলতে পারি, নাতিটীর মুখ একবাব দেখলে আপনাব মনে আর রাগ থাক্‌বে না। তখন আপনি বুঝতে পাববেন মা হয়ে মেযেকে জীবনের এই চরম স্বার্থকতা থেকে বঞ্চিত বাখতে চেষ্টা কবে কি ভুল করেচেন!"

শাশুড়ী দেশে ফিরিযা গেলেন। লালবিহারী সুহাসিনীর সহিত পবামর্শ করিয়া সুভাষিনীর নিকটে পত্র লিখিলেন। পত্রে লালবিহারী লিখিলেন যে, সুহাসিনীকে যখন তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর তাহাকে পবিত্যাগ করিতে পাবেন না। তবে সুভাসিনী যদি ইচ্ছা করে, সেখানে গিয়া তাহার দিদির সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে। সতীন হইলেও সুহাসিনী তাহাব পব নয—নিজেরই সহোদরা। কাজেই তাহার সহিত একত্রে বাস করিতে সুভাসিনীর আপত্তি থাকা উচিত নহে। আব সে যদি ভগ্নীর সহিত একত্রে বাস করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলেও স্বামী-সৌভাগ্য হইতে একেবারে সে বঞ্চিত হইবে না। তিনি মাঝে মাঝে দেশে যাইবেন, তাহার সহিত একত্রে বাস করিবেন।

ঐ চিঠির মধ্যে সুহাসিনী ছোটবোনের কাছে এক চিঠি দিল। চিঠিতে সে অন্যান্য কথাব সঙ্গে লিখিল—"একটা ভাল খাবার হাতে পাইলে কোনদিনই একা খাইয়া তৃপ্ত হই নাই, তোমাকেও খাওয়াইয়াছি, আজ বিধাতা যে সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা একা

উপভোগ করিয়া সাধ মিটিতেছে না। আমরা দুই বোন এক মা-বাবার কোলে লালিত পালিত হইয়াছি, এক স্বামীর অঙ্কে স্থান পাইব না কেন? তুমি জান তাঁহার হৃদয় কত প্রেমপূর্ণ। আমাদের দুই বোনকে তৃপ্তিদানের মত সামর্থ্য তাঁহার আছে। আমার শত মাথার দিব্য, তুমি এইখানে আসিতে রাজী হও, ইনি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিবেন।”

কিন্তু সুভাষিণী কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সেই যে প্রবাদ বাক্য আছে—

“নিম তিতা, নিসিন্দা তিতা
তিতা মাকাল ফল,
তার চাইতে অধিক তিতা
বোন সতীনের ঘব।”

উহাই সে সার বলিয়া ধবিয়া লইয়াছিল। তবে তাহার স্বামী আপনার প্রতিশ্রুতি-পালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বহুবার দেশের বাটীতে গিয়াছেন, দশ-পনেরো দিন করিয়া সেখানে অবস্থানও করিয়াছেন এবং প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার আরও কয়েকটী ছেলেমেয়েও হইয়াছে।

আলাপ করিবার মত কোন সঙ্গিনী না থাকায় সুহাসিনী খুবই অসুবিধা বোধ করিত। কাছারীর মুহুরী গোমস্তারা পরিবার লইয়া কাছেই বাস করিতেন; তাঁহাদের গৃহিনীদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সুহাসিনী তাঁহাদের বাসায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সংস্রব বর্জ্জন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। সে লালবিহারীকে সব কথা বলিল।

তাহার ইচ্ছা ছিল লালবিহারী কর্ম্মচারীদের ধমক্ দিয়া জানাইয়া দেয় যে তাহার অসম্মান করা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলের নহে। কিন্তু লালবিহারী ম্লানমুখে শুধু তাহাকে জানাইলেন যে, জোর করিয়া সম্মান আদায় করা চলিলেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা চলে না।

অবশেষে সুহাসিনীর একজন সঙ্গিনী মিলিল। নিকটবর্ত্তী থানার এক মুসলমান দারোগা তাঁহার রক্ষিতাকে আনিয়া নিজের বাসায় রাখিয়াছিলেন। মেয়েটীর নাম কুসুম। কুসুম আসিয়া একদিন সুহাসিনীর সহিত আলাপ করিয়া গেল, সুহাসিনীও দারোগার বাসায় গিয়া কুসুমের সহিত দেখা করিয়া আসিলেন। দারোগার সহিত লালবিহারীর পূর্ব্ব হইতেই সৌহার্দ্দ্য ছিল, কুসুম ও সুহাসিনীর মধ্যেও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল। দারোগার নির্ব্বন্ধাতাতিশয়ে এবং নিজেরও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে মনে করিয়া লালবিহারী দারোগার বাসার কাছে নূতন বাসা তৈয়েরী করিয়া সুহাসিনীকে লইয়া সেখানে গেলেন।

ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল। দারোগাবাবুর বাসায় সুহাসিনীর ঘন ঘন নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। লালবিহারীও দারোগাবাবুর "স্ত্রী"কে পাল্টা নিমন্ত্রণ না দিলেন এমন নহে; তবে সুহাসিনী একা, গুটীতিনেক সন্তানের মা হইয়াছেন, তাই পারিয়া উঠেন না! তাছাড়া আরও কিছু অসুবিধা ছিল। লালবিহারী মাছ-মাংস কিছুই খাইতেন না, সুহাসিনীর মধ্যে-মধ্যে মাছ চলিলেও মাংসের প্রবেশ বাড়ীতে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ কি দারোগাবাবু, কি কুসুম কাহারও একটী বেলাও মাংস ছাড়া চলে না।

একদিন লালবিহারী টের পাইলেন যে সুহাসিনী দারোগার বাসা হইতে মাংস লইয়া আসিয়াছে। এজন্য তিনি সুহাসিনীকে ভৎসনা

করিলে সুহাসিনী বলিলেন—“আমরা তো আর জাত বৈষ্ণব নই যে মাছ-মাংস ছুতে পারব না।” শুনিয়া লালবিহারীর রাগ হইল, বিদ্রুপ করিয়া তিনি কহিলেন—“তাই বটে। কথাটা আমার মনে ছিল না যে, বামুনের ছেলে মুসলমান হ’লে গরু খারার যম হ’য়ে দাঁড়ায়।” লালবিহারীকে খোঁটা দিয়া এবারে সুহাসিনী বলিল—“তাই বুঝি সাজ বৈষ্ণব একেবারে জাত বৈষ্ণব হয়ে উঠেছ?” লালবিহারীও পাল্টা জবাব দিল—“তোমার প্রমোশনটা কিন্তু আরও বেশী হয়েছে, একাদশী থেকে একেবারে মুর্গীর মাংসে।”

সেদিনকার ঝগড়া অনেকদূর গড়াইল। শেষে এমন হইল যে দারোগা-বাবুর সহিত হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার লইয়া লালবিহারী সুহাসিনীকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিলেন। সুহাসিনীও লালবিহারীর সহিত কুসুমের নাম জড়িত করিয়া দু’একটী কথা বলিলেন। ইহারই অল্প পরে ঝগড়া সেদিনকার মত মুলতুবী রহিল।

লালবিহারীবাবুর গৃহে একরকম শান্তি স্থাপিত হইল, কিন্তু দারোগা-বাবুর ঘরে খিটিমিটি লাগিয়াই রহিল। অবশেষে একদিন কুসুম-পাখী খাঁচা ভাঙিয়া উড়িয়া পালাইল।

কুসুমের পলায়নের পরে লালবিহারী মাত্র দুইবৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সে দুই বৎসরের তিনি অধিকাংশ সময়ই দেশে থাকিতেন; মৃত্যুও তাঁহার নিজের বাড়ীতেই হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি প্রথম পত্নী ও তাহার পুত্র কন্যাগণের জন্য অনেক আপশোষ করিয়াছেন, সুহাসিনীর নামটী পর্য্যন্ত নাকি মুখে আনেন নাই।

শুনা যায় সুহাসিনী তাঁহার শ্রাদ্ধের সময়ে পুত্রকন্যাদের লইয়া বাড়ীতে আসিতে চাহিয়াছিলেন। লালবিহারীবাবুর ভ্রাতা প্রতি-বাদী হইয়া দাঁড়াইবার ফলে তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

লালবিহারীবাবুর মৃত্যুর পরে সে তিন চারি বৎসর সেই মুসলমান দারোগার আশ্রয়ে কাটাইয়াছে, তাহার গুটিদুই ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। দারোগাবাবুর আশ্রয় হইতে চ্যুত হইয়া কিছুদিন সে সহরে ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে। তাহার এই ভিক্ষার ফলে লালবিহাবীর ঔরসজাত তাহার কয়েকটী পুত্র কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির নিকটে আশ্রয় পাইয়াছে। দারোগার ঔরসজাত সন্তান তিনটী লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সে নাকি এক সাধারণ মুসলমান ব্যবসায়ীকে বিবাহ করিয়া অদ্যাপি তাহার হারেমে বাস করিতেছে।

যে নারী একবার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অবৈধ প্রেমে মশগুল হয় সে কখনও এক পুরুষে তৃপ্ত থাকে না। প্রগতি-পন্থী বাঙ্গালী এই বিধবাটীর বিবাহে হয়ত সুখী হইয়া থাকিবেন কিন্তু তাহাব ভযাবহ পরিণাম দর্শনেও কি চৈতন্য উদয হইবে না ?

সরযূ ব্যানার্জ্জী+মোহিত মিত্র

শিবপুরের একখানি পুরাতন বাড়ীতে বৃদ্ধ শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন। হাওড়া জিলার কোন্নগরে তাঁহার পৈতৃক নিবাস, পেশা ছিল যাজন। কলেরার আক্রমণে অল্প সময়ের ব্যবধানে স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূকে হারাইয়া বৃদ্ধ এগারো বৎসর বয়সী নাতনী সরযূকে বুকে করিয়া শিবপুরে আসিয়া বাসা লইয়াছেন। তিনি হাওড়ার রেলওয়ে ওয়ার্কসপে আশীটি টাকা বেতন পান। পুত্র উপযুক্ত হইয়াছিল; বৃদ্ধ আশা করিয়াছিলেন, পুত্রের কাঁধে সংসারের বোঝা তুলিয়া দিয়া নিরালায় বসিয়া ভগবানের নাম করিয়া দিন কাটাইবেন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল বিপরীত; দুরন্ত কালের আক্রমণে সর্ব্বস্বহারা হইয়া ঐ শিবরাত্রির সলিতা নাতিনিটীকে লইয়া তাঁহকে সংসার সাগরে ভাসিতে হইল। অতীত দিনের সুখ দুঃখের শতসহস্র স্মৃতি বিজড়িত গৃহে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই তিনি বাপ পিতামহের ভিটার মায়া পরিত্যাগ করিয়া শিবপুরে চলিয়া আসিলেন।

কিন্তু নূতন ভাবনা আসিয়া বৃদ্ধকে নূতন করিয়া উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। নাতনী সরযূর বয়স এগারো হইয়াছে, আর কতদিন তাঁহার নিজের কোলে আটক করিয়া রাখা চলিবে? গৌরীদানের পুন্যার্জ্জন একালে অপরিহার্য্য না হইলেও তিন-চারি বৎসর পরে তো সরযূর বিবাহ না দিলে চলিবে না! নয়নের পুতলী নাতিনীকে পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া কি করিয়া তিনি শূন্য ঘরে দিন কাটাইবেন? সে ঘোরতর দুর্দ্দিনের কথা ভাবিতে ও যে বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠেন!

সাহেব সাজিবার ইচ্ছা না থাকিলেও চাকরীর জন্য যেমন অনেকের বাধ্য হইয়া সাহেব সাজিতে হয়, তেমনি দায়ে পড়িলে অনেক সময়ে সেকেলে লোককে একেলে সাজিতে হয়। বৃদ্ধ শিবকালী বাড়ুজ্যে মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি নাতনীর বিবাহ দিবেন না, তাহাকে পড়াইয়া-শুনাইয়া মানুষ করিবেন—তারপর মাষ্টারী কি নার্সিংএ ঢুকাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার অবর্ত্তমানে সে নিজে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে, তাহাতে বৃদ্ধের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই থাকিবে না।

সরযূ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। রোজ আফিসে যাইবার সময়ে তাহার দাদু তাহাকে নিজে স্কুলে পৌছাইয়া দেন, আফিস হইতে ফিরিবার সময়ে বাসায় লইয়া আসেন। কিন্তু কেবল স্কুলের পড়ায় চলে না, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইলে বাড়ীতে একজন শিক্ষক রাখা দরকার। শিবকালীবাবু নাতিনীর জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন, মাষ্টার মহাশয় রোজ সন্ধ্যায় দুইঘণ্টা করিয়া তাঁহাকে পড়াইয়া যান। বৎসর দুই পড়াইয়া এ মাষ্টার বিদায় লইলেন। এবারে দাদু নাতিনীর জন্য এক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই শিক্ষয়িত্রীর পরে আরও এক শিক্ষয়িত্রী সরযূর গৃহশিক্ষকতা করিলেন। এইভাবে আরও বৎসর তিনেক কাটিয়া গেল।

সরযূ এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে। এখন আর তাহার জন্য গ্রাজুয়েট শিক্ষক না রাখিলে চলে না। সরযূর বয়সও ষোল হইয়াছে, মহিলা গ্রাজুয়েট পাইলেই ভাল হইত। কিন্তু হাওড়া-শিবপুরে মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া যায় কই? কলিকাতা হইতে মহিলা-গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া লওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহাকে এত অধিক বেতন দিতে হয়, শিবকালীবাবুর পক্ষে যাহা কুলাইয়া উঠা অসম্ভব। নিরুপায় হইয়া তিনি একজন সচ্চরিত্র ও বিবাহিত পুরুষশিক্ষক রাখিবার সঙ্কল্প

কবিলেন। পবিচিত মহলে এরূপ শিক্ষক না পাইয়া শিবকালীবাবু সংবদেপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন।

বস্তায় বস্তায় আবেদনপত্র আসিতে লাগিল। দলে দলে যুবক বাসায় আসিয়া সাক্ষাৎও কবিল। যাহাবা সাক্ষাৎ কবিতে আসিল, তাহাদেব কাহাকেও বৃদ্ধেব পছন্দ হইল না। তাহাদেব কেহ হযতো ছাত্রীটীকে দেখিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবে, কেহবা 'ছাত্রীব বয়স কত' এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা কবে। অনেকে এইরূপ কথাও প্রকাশ কবিল যে সে ধনীব ঘবেব শিক্ষিত সন্তান—টিউসানীটা ফ্যাসান মাত্র, নহিলে কুড়ি টাকা বেনেব ভৃত্য তাহাবা অনেক পুষিতে পাবে। বলা বাহুল্য —বৃদ্ধ ইহাদেব সকলকেই বিদায় কবিয়া দিলেন।

লিখিত দবখাস্তগুলি সবযূ নিজেই একবাব কবিযা পডিযা দেখিল। একখানি দবখাস্ত দাদুব হাতে দিযা সে বলিল—"দাদু, এইখানা পড়ে দেখ। এই ভদ্রলোককে হযতো বাখা যেতে পাবে।" দাদু দবখাস্ত-খানা পডিযা দেখিলেন ছেলেটী গ্র্যাজুযেট। বিবাহিত—কলিকাতায় কোন স্কুলে মাষ্টাবী কবে। মাষ্টাবীতে যাহা বেতন পায়, বাডীতেই পাঠাইতে হয়। টিউসানীটী পাইলে আইন পডিবে, এই তাহাব বাসনা।

দবখাস্ত পডিযা দাদু জিজ্ঞাসা কবিলেন—"তোব কি মনে হয় সবযূ?"

সরযূ বলিল—"আমাব তো ভালই মনে হয।" সবযূব কথা মত দাদু ছেলেটাব ঠিকানায় একখানা পোষ্টকার্ড পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছেলেটী আসিয়া দবজাব কডা নাডিল। দাদু তখন আহ্নিক কবিতেছিলেন, সবযূই দবজা খুলিযা দিল। প্রশ্ন কবিল—"আপনিই মোহিতবাবু?"

ছেলেটী—সরযূ দেখিল নেহাৎ ছেলেটী নহে, বয়স তাহার ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ অবয়ব, যেন প্রবীণ একজন পুরুষ। সে কহিল—"হ্যাঁ, তুমিই বুঝি পড়্‌বে?" তা তোমার বাবা কোথায়?"

সরযূ বলিল—"বাবা নাই, তিনি আমার দাদা ম'শায়। তিনি আহ্নিক করুছেন। আপনি বসুন এসে এ-ঘরে।"

মোহিতকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া সবযূ উপরে চলিয়া গেল। দশ-বারো মিনিট পবে দাতুর সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করিল। মোহিত-কুমাব সেইদিন হইতেই সরযূবালার গৃহ-শিক্ষকের পদে বাহাল হইলেন।

কয়েকদিন মোহিতমোহন নিকট পড়িবার পরে সরযূ একদিন তাহার দাতুকে বলিল—"দাতু, মাষ্টার ম'শাইব এক নূতন বিদ্যা ধরে ফেলেছি। তিনি ভালো গাইতে জানেন। আমার ভাঙ্গা এস্রাজটা এঘবে পড়েছিল, এসে দেখি মাষ্টার ম'শায় তাব ছেঁড়া তারগুলো সেড়ে দিচ্ছেন। দিব্যি তিনি সেটাকে আস্ত করে দিলেন—তারপব টুংটাং কবে বাজিযে দেখলেন স্থর ঠিক হচ্ছে কিনা। শেসে স্থর বেঁধে নিয়ে সেটাকে বাজাতে লাগলেন। দেখলাম, তিনি বেশ গান।"

দাতু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি তাঁকে বলে দেব, যাতে তিনি তোকে তু'একখানা গানও শেখান।

সবযূ বলিল—সে আব তোমায় বল্‌তে হবে না। আমি মাষ্টার ম'শয়ের কাছে এরই মধ্যে গান শিখতে স্থরু করেছি।"

সরযূব ক্লাশের পড়া পড়াইয়া মোহিত যে তাহাকে গান শিখাইতে যথেষ্ট সময় পাইতেন তাহা নহে। মোহিত সরযূকে একখানি রবি ঠাকুরের স্বরলিপির বই কিনিয়া দিয়াছিল, বোজ পড়া শেষ হইলে হারমোনিয়ম লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া তাহারি একখানি গান সে সরযূকে

শুনাইত। সরযূও অবসর সময়ে সেই গানখানি করিত—পরদিন পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই গানখানি সে মাষ্টার মহাশয়কে গাহিয়া শুনাইত, ফলে তাহাদেব প্রতিদিনকার প্রথম পরিচয় গানের মধ্য দিয়াই হইত। কোনদিন ভুলে সরযূ হারমোনিয়ম না আনিয়া খালি বই লইয়া টেবিলে বসিলে মাষ্টার-মশায় বলিতেন—কৈ সরযূ আজ তোমার 'উদ্বোধন সঙ্গীত' হবে না? হারমোনিয়মের ঘাট টিপিতে টিপিতে হাসিয়া সরযূ বলিত—"উদ্বোধন সঙ্গীত নয় মাষ্টার-ম'শাই এহচ্ছে আপনারই আবাহন-গীতি।" কোনদিন বা সরযূ যদি গাহিত—"ওগো সুন্দব, আজি মম পরমোৎসব রাতি" তাহা হইলে মাষ্টার-ম'শায় হাসিয়া বলিতেন আজকার আবাহন সঙ্গীতটা যেন কেমন হ'ল সরযূ—না!

সরযূর মুখ লাল হইয়া উঠিত।

সঙ্গীত চর্চ্চাব সঙ্গে কাব্য চর্চ্চা। মনস্তত্ত্বেব ও চর্চ্চা যে কিছু কিছু হইত না, এমন কথা আমবা হলপ কবিয়া বলিতে পারি না। অবশেষে একদিন সরযূ বলিল—মাষ্টার ম'শায, আপনার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী? মাষ্টার ম'শায় বলিলেন—তার আগে বরং প্রশ্ন কর, আমার বিয়ে হয়েছে কিনা! সরযূ বলিল--সে কি? আপনি নিজেই তো বলেছেন, আপনাব বিয়ে হ'যেছে। মাষ্টার বলিলেন—সে তো তোমার married tutor (বিবাহিত শিক্ষক) চেয়েছিলে বলেও বল্‌তে পারি। আচ্ছা সরযূ, বয়স্থা মেয়েদের জন্যে married tutor (বিবাহিত শিক্ষক) যে লোকে চায় তার মানে কি জান! সরযূ বলিল—কি জানি! মাষ্টার বলিলেন—"আমার মনে হয়, marriage (বিবাহের) এর experience (অভিজ্ঞতা) না থাকলে marriagable (বিবাহোপযুক্তা) মেয়েদের শিক্ষাদান complete (সম্পূর্ণ) হবে না বলে!"

তৎক্ষণাৎ মাষ্টার মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, কিন্তু ছাত্রীটীর দশা সুবিধা বলিয়া বোধ হইল না। Marriageable (বিবাহোপযুক্তা) মেয়ে আর marriage (বিবাহের) এর experience (অভিজ্ঞতা) এই দু'টী কথা তাহার মনে কেবলি ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল —কি সে অভিজ্ঞতা, যাহা বিবাহিত জীবনে লাভ করা যায়! দাদুর স্নেহ-যত্নে পালিতা তাহার সমস্ত মনখানি আচ্ছন্ন করিয়াছিল ঐ দাদু। বাড়ীতে তাহাব কোন স্ত্রী-অবিভাবক নাই, দাদুও কোনদিন তাহাব সম্মুখে বিবাহেব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই; দু'চার বার কেবল তাহাকে কাছে ডাকিযা বসাইযা প্রশ্ন কবিয়াছিলেন—আজ যেমন আমার বুক ঠাণ্ডা করে আছিস্, চিবদিন এমনি থাক্‌তে পাববিনে দিদি? কিছু না ভাবিযাই সে উত্তব করিয়াছিল—কেন পারবো না দাদু?

একদিন সরযূ মাষ্টারেব নিকট প্রশ্ন করিয়া বসিল—মাষ্টার ম'শাই, সবাই কি বিযে করে? মাষ্টার উত্তর কবিলেন—মোটামুটি তাই বলা চলে। ইহাতে সে আবার প্রশ্ন করিল—কেন মাষ্টার ম'শাই, বিযে না করলে চলে না? একটু ভাবিয়া লইয়া মাষ্টার উত্তর করিলেন —সেটা যে বিয়ে করবে তার নিজের উপর নির্ভর করে। সরযূ বলিল—তাই যদি করে, তাহ'লে কে সাধকরে বিয়ে কর্‌তে যায়? বিয়ে করার যে অনেক ফ্যাসাদ—মেয়েদের বিয়ে হ'লে পরের বাড়ী যেতে হয়, পরের মন জুগিযে চলতে হয় আর ছেলেদের ওপর তো ভরণপোষণের বোঝাই চেপে বসে। এ বিয়েতে সাধ যায় কার? মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—সাধ কি আর শুধু যায়, বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়ে।' সরযূ আবার শুধাইল—তার মানে? মাষ্টার বলিলেন

—এর মানে ঠিক কেউ কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারে না। যখন যার বুঝবার সময় আসে, তখন নিজেই বুঝে ওঠে। এসব কথার জবাব পেতে হ'লে আপনাকে বুঝতে চেষ্টা কর সরযূ, ভাব্‌তে শেখ—কোন দিকে কোন অভাব বোধ কর্‌ছ কি না। বিয়ের ফলে নারী পায় একজন পুরুষ সঙ্গ, পুরুষ পায় একজন সঙ্গিনী, যাকে তার সেই বয়সে সেই মুহূর্ত্তে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। সাহসে ভর করিয়া মাষ্টার মহাশয় আরও অগ্রসর হইলেন, কহিলেন—এই অভাব বোধ যখন ঘটে, তখন বিয়ের স্বাভাবিক উপায়ে সেটার পূরণ না হ'লে অস্বাভাবিক উপায়ে নিজে তা'রা সেটা পূরণ করে নেয়। সরযূ এই তথ্যটী জানিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। সে মরীয়া হইয়া প্রশ্ন তুলিল—তার মানে? মাষ্টাব বলিলেন—মানে বুঝে নিতে হয়, তবে এইটুকু বলা যায় যে, জলে যখন নদী ভরে ওঠে, তখন বাঁধ ভেঙ্গে সহজ পথে তাকে চল্‌তে না দিলে সে কূল ছাপিয়ে যেতে চায়। বুঝলে সরযূ?

সরযূ আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

বৈশাখ মাস আসিল। সরযর মর্ণিং স্কুল, মোহিতমোহনেরও তাই। বিকাল বেলা মোহিতের আইনের ক্লাশ, সে দুপুর বেলা সরযূকে পড়াইতে আসিত। সরযূ আর দাদু ছাড়া বাড়ীতে মানুষের মধ্যে এক ঠিকা ঝি আর আর এক বামুন ঠাকরুণ। ঠিকা ঝি কাজ শেষ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত, বামুন ঠাকরুণও এবাড়ী ওবাড়ী যাইতেন। তাই এখন দুপুরে সারা বাড়ীতে দু'টী প্রাণী—মোহিতমোহম আর সরযূ। শিক্ষাদানে মাষ্টার মহাশয়ের ছিল যেমন গরজ, ছাত্রীরও তেমনি উৎসাহ। তাই শিক্ষাকার্য্য অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিল। অবশেষে একদিন যরয বলিল—আজ আর পড়ব না। মোহিত কহিলেন—কেন, পুথিগত বিদ্যায় অরুচি ধরে গেল নাকি? সরযূ

কহিল—আমি বুঝি তাই বলছি। মোহিত বলিল—একবারে বয়কট করলে চলবে না, উপলক্ষ্যস্বরূপ এটা রাখতে হবে। নইলে তোমার কাছে থাকলেও তোমার দাদুর কাছে আমার মাষ্টারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

সরযূ বলিল—তোমার মুখে ও ছাড়া আর কথা নেই নাকি! আমার আজ শরীরটে ভাল নেই বলে আমি পড়্‌ব না।

মোহিত ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিল—কেন, গা বমি-বমি করছে নাকি? সরযূ জানাইল যে বমি বমি তো করছেই, মাথাটা যেন তুলতে পার্‌ছিনে।

সরযূর কথা শুনিয়া মোহিতমোহনের বুকের ভিতরটা ঢিব্ ঢিব করিতে লাগিল। এক নূতন আশঙ্কা তার মনের মধ্যে উদিত হইল। সেও অসুস্থ বোধ করিতেছে, সে বাহির হইয়া গেল। অনেক ভাবিয়া এইখানেই নিশ্চিন্ত ধারণা গঠন করা সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া সে আরও কিছুদিন চুপি চুপি বসিয়া রহিল। মাস দুই পরে সবযূর কাছে আবার সে কথাটা পাড়িল। সরযূ বলিল,—ভাল নেই। "কেন, অসুখ করেছে নাকি?" সরযূ বলিল,—অসুখ বিশেষ কিছু সে বোধ করিতেছে না, তবে শরীরটা তাহার দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছে।

ইহার পরে একদিন ঝি বলিল—দিদিমণির শরীবটা বুঝি ভাল নেই? কি হ'ল তোমার দিদিমণি? বামুন-ঠাকরুণও একদিন ঐ প্রশ্নই করিলেন। দাদুও বলিলেন—শুনলুম, তুই প্রায়ই বিকেলে ভাত খাচ্ছিস্‌নে দিদি! কি হ'ল তোর? অসুখ-বিসুখ হ'লে চেপে রাখা উচিত নয়। ডাক্তার দেখানো দরকার। সরযূ কাহারও কথার জবাব দিতে পারিল না। শেষে একদিন মোহিতমোহনের

কাছে কথাটা পাড়িল। মোহিত তাহার নিকটে প্রশ্ন করিয়া অনেক কথাই জানিয়া লইল। শেষে বলিল—ভিতরে ভিতরে নিশ্চয় একটা কিছু অসুখ করেছে। আমার একজন ডাক্তার বন্ধু আছে, তার কাছে জিজ্ঞেস করে তোমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেব।

আর একদিন সরযূ মোহিতকে ধরিয়া পড়িল—তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

মোহিত কহিল—হ্যাঁ। পড়ার চাপ বড় বেশী পড়েছে, ওদিকে স্কুলেও ছেলেদের এক্‌জামিন এগিয়ে এসেছে। রোজ এসে তোমায় পড়ানো সম্ভব হবে না।

সরযূ বলিল—তাব মানে আমাদের বাড়ীতে আর আস্‌বে না? বলিয়াই সরযূ কাঁদিয়া ফেলিল। মোহিত নিজের আসন হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—আমি তোমা-দের বাড়ীতে আসবো না, একি তুমি বিশ্বাস করতে পার সরযূ। তোমার সাথে দেখা করে যাব বৈকি!

সরযূ বলিল—কিন্তু ওরা যে কত কি সব বিশ্রী কথা বলে!

মোহিত ব্যস্ততার সহিত প্রশ্ন করিল—ওরা কে? সরযূ কহিল—ঝি আর বামুন ঠাকরুণ। মোহিত বলিল—তাদের কথা রেখে দাও, কি আর তারা বোঝে!

সরযূ টেবিলের উপরে মাথা গুঁজিয়া বলিল—দেখো, শেষকালে আমার সর্ব্বনাশ করে পালিও না যেন।

মোহিত বলিল—পাগল। তোমার সর্ব্বনাশই হয়নি, তা আর পালাবো কি? এ একটা অসুখ, আপনি সেরে যাবে।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সরযূ বুঝিতে পারিল, মোহিত তাহাকে বৃথা আশ্বাস দিয়াছে। দশ-পনেরো দিন কাটিয়া গেল, অথচ মোহিতের চুলের টিকিটী দেখা নাই। সে একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িল।

ওদিকে বামুন ঠাকরুণ একদিন তাহাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, সে যে সন্তানের মা হইতে চলিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ঝিও এই কথাই বলিল। তবে সে সঙ্গে সঙ্গে এ উপদেশও বর্ষণ করিতে ছাড়িল না যে এই ব্যাপারে ভয় পাইযা চুপ করিয়া থাকা তাহার কর্ত্তব্য নহে, কথাটা বুড়োর (সরযূব দাদুর) কাণে তুলিয়া মাষ্টারকে জোব করিয়া ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য। সরযূ শুধু বলিল—একথা দাদুর কানে গেলে দাদুকে যে মুখ দেখাইতে পাবিবে না। তাহার পবিবর্ত্তে সে বরং একদিক চলিযা যাইবে অথবা গঙ্গায় ডুবিযা সকল জ্বালা জুড়াইবে।

কিন্তু কথাটা শিকালীবাবুর কানে পৌছিল। তিনি সরযূকে ডাকাইলেন। সরযূ আসিয়া অপরাধীব ন্যায় তাঁহাব কাছে দাঁড়াইল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে শিবকালীবাবু প্রশ্ন করিল—"যা শুন্‌ছি তাকি সত্য সবযূ।"

সবযূ মুখে কোন উত্তব কবিল না, নীরবে দাঁড়াইযা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিলেন—আমারই ভুল হয়েছে। সাতপুরুষেব যা প্রথা, সেই গৌরীদানে অবজ্ঞা কবে সহরে এনে বিবি বানিয়েছিলাম, তাহার ফল হাতে হাতে ফল্‌ল। পোড়ামুখী আর আমায় মুখ দেখাস্‌নে—বিষ খেয়ে মর গে যা।

মুখে তিনি একথা বলিলেন বটে, কিন্তু নিজেই গিযা মোহিতদের মেসে হাজির হইলেন। মোহিত মেসে ছিল না; মোহিতের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত তিনি এবিষয়ে আলাপ করিলেন। সে মোহিতের উপব ক্ষেপিয়া গেল। বলিল—যেমন করিয়া হৌক, মোহিতকে বিবাহে রাজী করাইবেই; তিনি যেন কাছাকাছি কোন দিনে বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। শিবকালীবাবু বলিলেন—বামুন কায়েতে বিয়ে, তার

আবার তারিখ! কোন রকমে মেয়েটাকে ওর গলায় গেঁথে দাও বাবা।

ভাদ্রমাসে প্রশস্ত না হইলেও অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ চলিতে পারে। শিবকালীবাবু সংক্ষেপে বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিকালের দিকে মেসের ঐ বন্ধু খবর দিল—মোহিতকে পাওয়া যাইতেছে না। শিবকালীবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। কথাটা শুনিয়া সরযূ মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মূৰ্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় সে আর উঠিয়া বসিতে পারিল না। ডাক্তাব আনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল।

রাত্রি ৯টার সময়ে এক ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তিন-চারিটী ছেলে মোহিতকে লইযা উপস্থিত হইল। একটী ছেলে চুপি চুপি শিবকালীবাবুকে জানাইল যে, অনেক খুঁজিয়া তবে কালীঘাটে মোহিতের মাসীর বাসা হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছে। মাসী খুব ভাল মানুষ; তাঁহার কাছে সবকথা খুলিয়া বলায় তিনিই মোহিতকে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়াছেন। মোহিতের মেসো'ও সঙ্গে আসিয়াছেন।

সরযূর শরীর তখনও অসুস্থ ছিল। সেই অসুস্থ শরীর লইয়া তাহাকে বিবাহের সভায় আসিতে হইল। শুভদৃষ্টির সময় সে নাকি চোখ বুজিয়া ছিল। যে মোহিত তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, তাহার নিকট আত্মদানে সরযূর আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। নিতান্ত বাধ্য হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে সে বিবাহের প্রহসনে আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া গেল। মনে মনে সে মোহিতকেও ততটা ধিক্কার দিল না, যতটা ধিক্কাব দিল নিজেকে। মোহিতের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, ঘর সংসার আছে। সে সব ফেলিয়া সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে যদি রাজী না হয়, সরযূ তাহাকে দোষী করে কি করিয়া!

কিন্তু সে কি করিল? প্রবৃত্তির তাড়নায় অধীর হইয়া সানন্দে ও স্বেচ্ছায় মোহিতের কামাগ্নির যুপকাষ্ঠে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি চরিত্র-ধর্ম্ম, ইহকাল-পরকাল সব বলি দিয়া বসিল, তাহার বড় আদরের বড় সাধের দাদুর অকলঙ্ক কুলে কালি দিল—যে স্নেহ-পরায়ণ বৃদ্ধ সতেরো বৎসর ধরিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, নির্ম্মম ঘাতকের মত তাঁহারই বুকে ছুরী বসাইয়া দিল!

বিবাহের লগ্ন শেষরাত্রে ছিল। সুতরাং সেদিন বেশীক্ষণ সরযূকে 'স্বামী' সঙ্গে মরণের বিষজ্বালা অনুভব করিতে হয় নাই। পরদিন কালরাত্রি, একত্র শয়নের বালাই নাই। পুষ্পশয্যার রাত্রে সরযূকে বিষম শঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইল। সেরাত্রে সে কিছুতেই মোহিতের বাহুবন্ধনে আত্মসমর্পন করিল না। মোহিতের সকল সাধ্য-সাধনা ব্যর্থ হইল।

বৃদ্ধ শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকে এ ব্যথা বড় নির্ম্মমরূপে বাজিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কাশী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোহিতের মেসো মোহিত ও সরযূকে কালীঘাটে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের ঘর-সংসার বাঁধিয়া দিবেন, এই আশ্বাস দিলে তিনি কাশীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেদিন সরযূরা কালীঘাটে চলিয়া গেল, সেইদিনই তিনিও কাশীযাত্রা করিলেন।

কিছুদিন সরযূ ও মোহিত কালীঘাটে মোহিতের বাসাতেই রহিলেন। বিবাহের রাত্রি হইতে সরযূ মোহিতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, সে বিদ্রোহ সে বজায় রাখিতে পারিল না—ক্রমে মোহিতের নিকটে নূতন করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। এ আত্মসমর্পণের অবশ্য অন্য কারণও ছিল। মোহিতকে সে বিশ্বাস করিতে পারিত না; মোহিতের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে মোহিত

তাহার মাসীমা ও মেসোকে ভুল বুঝাইতে পারে—বুঝাইতে পারে যে, সরযূর অবস্থার জন্য সে দায়ী ছিল না, আসলে যে দায়ী সেই সরযূর মন যুড়িয়া রহিয়াছে। একথা ভাবিতেও সরযূ শিহরিয়া উঠিল। নিজের মনকে কতকটা স্থস্থির করিয়া লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোহিতের নিকটে আত্মসমর্পণ করিল। মোহিতের তরফ হইতে আপত্তি দেখা গেল না। মোহিতের চরিত্রের এই দিকটা জানিত বলিয়া সরযূর মন আরও বিষাইয়া উঠিত। তথাপি সে নিজকে মহাপাপিষ্ঠের কামনানলে আহুতি প্রাদান করিল।

এদিকে মোহিতের মেসোর চিঠি পাইয়া মোহিতের পিতা রাগিয়া উঠিলেন। মোহিতকে তিনি অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। "অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতেছি" এই অজুহাত দিয়া মোহিত দেশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ তো দেখা গেলেই না, পরন্তু সরযূর মাসীমার কাছে কোন চিঠিপত্রও সে লিখিল না। মোহিতের মেসো মোহিতের বাবার কাছে কোন চিঠি লিখিলে তিনি জবাব দিলেন—মোহিত দেশের ইস্কুলে মাষ্টারী লইয়াছে। তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। ভ্রমবশে মোহিত যদি কোন অন্যায় করিয়াও থাকে তবে জীবন-ভোর যে সে সেই অন্যায়ের বোঝা বহিয়া বেড়াইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। দেশে মোহিতের স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা আছে; তাহাদের প্রতি অবিচার করিতে সে পারিবে না······ইত্যাদি।

সরযূকে এ চিঠির কথা জানাইবার আগে মোহিতের মেসো স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন। মোহিতের মা জীবিতা ছিলেন না, থাকিলে মাসীর প্রভাব খাটিত। তথাপি মোহিতের মেসো সরযূকে লইয়া মোহিতদের বাড়ী যাইতে চাহিলেন। সরযূ অস্বীকৃত হইল। বলিল

—"আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। ওরা যদি স্বেচ্ছায় আমাকে পরিত্যাগ করে, তাহ'লে আমি কি করে আমার জোর খাটাইব? আমায় যদি কাশীতে পৌছে দেন দয়া করে, দাদু আমাকে তাঁর পায়ে স্থান দেবেনই। তারপর বাবা বিশ্বনাথ আছেন।"

মোহিতের মাসী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ও মেসো দু'জনেই সরযূকে কন্যাতুল্য ভালবাসিতেছিলেন। তাঁহারা তাহাকে নিজেদের কাছে রাখিতে চাহিলেন। সরয রাজী হইল। সে কালীঘাটের বাসায়ই থাকিয়া গেল। এখনও সে সেখানে আছে।

যথাসময়ে সরযূ একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। মেসো ও মাসী দু'জনেই ছেলেটীকে পুত্রাধিক স্নেহে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহাদের যত্নে সরযূর দিনগুলি একরকম মন্দ কটিতেছে না। কিন্তু ভাবিতেছি—সরযূর পুত্রটীর অবস্থা ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে! দাদা-দিদি হয়তো তাহার জন্য কিছু অর্থের সংস্থান রাখিয়া যাইবেন, লেখাপড়া শিখিয়া হয়তো সেও মানুষ হইবে—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে শিখিবে। অর্থের আধিক্য থাকিলে সে হয়তো সংসারে প্রবেশ করিতে—নিজে ভাল বিবাহ করিতে, পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিতে পারিবে। কিন্তু তবু তো সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সমাজে মিশিতে পারিবে না; সমাজের বুকে এক পরগাছা বংশের সৃষ্টি করিয়া যাইবে মাত্র। দেশে থাকিয়াও তাহারা হইবে পরদেশী, দশের মধ্যে থাকিয়াও হইয়া রহিবে একক। এপ্রকার লজ্জায় নিশ্চয়ই সে ভবিষ্য-গোষ্ঠী তাহাদের জনক-জননীকে অভিশম্পাত করিবে, আপনাদের দৈহিক ক্ষুধার তৃপ্তির জন্যই যাঁহারা তাহাদিগকে এসংসারে আনিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার দিবে সেই প্রগতিকে সীমা ছাড়াইয়া ভূমার পানে, সম্ভাব্য ছাড়াইয়া অসম্ভবের পানে ধাবিত হইয়া যাহা এই ঘোরতর অনর্থের সৃষ্টি কারিয়াছে।

মলিনা গুহ+মোহিনী গুহ

"তাকেই বলে পরশ-পাথর—ঠেক্‌লে পরেই সোনা।
মুকুল যদি ঝরিয়া না যায়—ফলবে পাকা নোনা॥
ফল্গম্‌-ফলে-ফলানী'তেই সৃষ্টি যখন চলে।
পয়মন্ত ছোঁয়াচ লেগে সোনার যাদু ফলে॥
তরুণ যুগের অরুণ উদয়—ভাশুর-বধূর খেলা।
এই খেলাতেই মাণিক আনে—ধর ভেলা এই বেলা॥"

একবালপুর একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম—পাঠান আমল হইতে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও একবালপুর পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বক্ষ্যমান আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুত মোহীনিমোহন গুহ এই গ্রামেরই অধিবাসী। মোহিনীবাবু একবাল-পুরের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশের সন্তান। তিনি শিক্ষিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। তিনি সচ্চরিত্র, অমায়িক এবং স্বদেশসেবী। দেশমাতৃকার সেবা তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত। এই ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—বিবাহ করিয়া নিজকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। বিবাহ করিলে স্ত্রীটী একরাশি অলঙ্কার ও আনুসঙ্গিক তৈজসপত্রের বোঝা স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া যাযাবর তাঁহাকে অস্থাবর করিয়া তুলিতে চাহিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিবে পুত্রকন্যা—মাইপোষ, লজেনজুস, শ্লেট পেন্সিল, চুল বাঁধি-বার ফিতা কাঁটা স্নো, ক্রীম ও ডুরী শাড়ীর আবদার লইয়া;

তারপর গয়লার বিল, স্কুলের মাহিনা, বিবাহের পণ এগুলিও পরপর আসিয়া পড়িবে ; তাহাদের মোহিনীমায়ায় আবদ্ধ হইয়া জড়পিণ্ডে পরিণত হইতে হইবে—বিবাহ সম্বন্ধে মোহিনীবাবুর এইরূপ ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজে তো চিরকুমার-সভার সদস্যপদে স্থিত হইয়াছেনই, কুমার-সভার সভ্য-বৃদ্ধির মানসে অপরকেও অযাচিত এবং অক্লান্তভাবে অবিবাহিত জীবন যাপনের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিল—মোহিতবাবু দেশকর্ম্মী। স্বদেশ-সেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি কিছু নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছেন এবং তাহারই কিঞ্চিৎ ক্ষতিপুরণরূপে দেশসেবীগণকে ইজারা দেওয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন বৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক নহে, সুতরাং গুরুর কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তবে গুরুর সেবিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নাই—কুমার ছাত্রগণের কৌমার্য্যব্রত যাহাতে স্থায়ী হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের নিকটে সহজবোধ্য ভাষায় অনেক অমূল্য উপদেশ বর্ষণ করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র নরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে সুনির্ব্বাচিত বীজসমূহ বপন করিতে পারিলে অভীষ্টানুযায়ী ফসল উৎপাদন সম্ভবপর, এ তথ্য মোহিনীমোহনের অজ্ঞাত নহে। তাই তিনি এখন হইতে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বী হইলেও মোহিনীবাবু দণ্ডী-সন্ন্যাসী নহেন। সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারের বাহিরে একক অবস্থান করিবার মত স্বার্থপরতা তাঁহাতে নাই। হংস যেমন সর্ব্বদা জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইয়াও গায়ে জল লাগায় না, তিনিও তেমন সংসার মধ্যে

অবস্থান করিয়াও সংসারের দূষিত স্পর্শ হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। অবশ্য এস্থলে সংসার বলিতে বহু পরিজনের বিস্তৃত পরিবার বুঝাইতেছেনা। একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নীকে লইয়া এই সংসার।

সামান্য আয়ের কর্ম্মচারীর কলিকাতার বাসা। একখানিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীসহ সংসার ধর্ম্ম যাপন করেন এবং অপর একখানিতে মোহিনী তাঁহার গেরুয়াবিহীন সন্ন্যাসব্রত পালন করেন। কি কঠিন এই ব্রত! সংসার-চিত্র সর্ব্বদা তাঁহার চ'ক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত, তাহার সমস্ত মনোহারিতা লইয়া—অথচ তাঁহার নিকটে উহা forbidden fruit (নিষিদ্ধ ফল) মাত্র। ওঘর হইতে স্বামী-স্ত্রীর কল-কণ্ঠ মুখরিত হাস্যধ্বনি, প্রণয়োচ্ছ্বাসিত বাক্যালাপ, চুড়ির রিণিঠিনি—কাঁকণের কিনিকিনি সকলই মৃদুবায়ু-বিক্ষেপে এঘরে আসিয়া পৌছিতেছে, কখনও মোহিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন—কখনও জোর করিয়া অন্যদিকে চিত্ত-বিক্ষেপের চেষ্টা করিতেন—ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু তাই কি ছাই পারিতেছেন! প্রেমলীলার মধুময় চিত্রটী শ্রবণ দিয়াও অন্ততঃ উপভোগের বাসনা যায় বৈকি যখন তখন। আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি মোহিনীমোহন যদি মোহিনীমোহন না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ অবস্থায় ঠিক থাকিতে পারিতেন না। ঘটক লাগাইয়া দূত পাঠাইয়া একটি বিহাহ-যোগ্যা তরুণীর সকাম-রচিত যৌবন-প্রেম-সম্ভারে ওঘরের ন্যায় এঘরেও একটী প্রীতি-নিকেতন বসিত, ওপারের ঢেউ এপারেও আসিয়া তরঙ্গায়িত হইত।

মোহিনীমোহন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তিনি দেখিলেন—সংসারধর্ম্ম না করিলেও এতদূর নিস্পৃহতা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ তাঁহার উদাসীন ভাব স্নেহময় ভ্রাতাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে, ভ্রাতৃবধূকে

ব্যথিত করিতে পারে। তাহা ছাড়া যোগ-যাগহীন সন্ন্যাস ব্রত, পরিব্রজ্যাবিহীন বৈরাগ্য নিরাবলম্ব হইয়া থাকিতে পারে না। শাস্ত্রগ্রন্থের পরিবর্ত্তে কাব্যোপন্যাস, ব্রতোপবাসের পরিবর্ত্তে চা-কেক-বিস্কুট, গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, চিম্‌টার পরিবর্ত্তে ফাউণ্টেনপেন, আসন প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে ডাম্বেল-মুগুড় আর কৌপীনের পরিবর্ত্তে আণ্ডার-অয়েয়ার—ইহা লইয়া আর যাহাই চলুক—নিরালা, নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ সন্ন্যাস চলিতে পারে না। ইহার পরিবর্ত্তে তিনজনের একজন হইয়া, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর সুখ দুঃখের, আশা-নিরাশার, আনন্দ নিরানন্দের ভাগী হইয়া তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হইবে।

আরও এক কথা। তাঁহার এই নিস্পৃহতা দেখিয়া ভ্রাতা হয়তো ভাবিতে পারে—দাদা আমাকে একেবারেই পর করিয়া দিয়াছেন, বধূ হয়ত মনে করিতে পারে—আমাদের অস্তিত্বই উনি গ্রাহ্য করেন না। কিংবা হয়তো উহারা ইহাকে ঈর্ষাই মনে করিয়া বসিতে পারে···ছিঃ! আর এযে তাঁহারই ভ্রাতা, তাঁহারই ভ্রাতৃবধূ। বয়সে দুই তিন বৎসর মাত্র পার্থক্য হইলেও এই ভ্রাতা তাঁহার কত স্নেহের, কত যত্নের, কত আদরের! স্নেহের পাত্র ভ্রাতার অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া ঐ বধূও তাঁহার পরমস্নেহেরই পাত্রী। বয়সের তারতম্য হয়তো খুব বেশী না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বধূ তাঁহার স্নেহের আদরের ভ্রাতৃবধূ। চাকুরী, টাকা-পয়সার সাহার্য্য করিলে বা বাহিরের লোকের ন্যায় আপদে বিপদে সহায়তা করিলেই কি উহাদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? নিশ্চয় তাহা নহে! স্নেহ দিয়া, ভালবাসা দিয়া, সেবা দিয়া, সেবা করিবার সুযোগ দিয়া, বাক্য দিয়া, সঙ্গ দিয়া, আনন্দ দিয়া তাঁহাকে উহাদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা না করিলে উহাদের আনন্দই বা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে কেন, তিনিই বা তৃপ্ত হইবেন কিসে?

ভ্রাতা চাকুরীর সহিত টিউসনীও করিত। মোহিনী একদিন তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন,—তোর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে খোকা, টিউসনীটা ছেড়ে দে। দু'জনে আমরা যা পাই, তাই দিয়েই একরকম চলে যাবে'খন।

বধূকে ডাকিলেন—মলিনা, একটা কথা শোন।

মলিনা চায়ের কেটলী পরিষ্কার করিবার জন্য কলতলার দিকে যাইতেছিল, থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। ভাসুর তাহাকে এযাবৎ "বৌমা" বলিয়াই ডাকিতেছিলেন, মলিনা ডাকটা শুনিয়া যে বিস্মিত হইলেও ডাকটা তাহার কানে বড় মিষ্টি লাগিল। সে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহিনী বলিলেন—সকাল বেলা চায়ের সঙ্গে কচুরি বরং নাই করলে আজ থেকে। একা মানুষ, এতে তোমার কষ্ট হয়। চা-চিনি সব আছে তো? আচ্ছা—

এখন হইতে যখন তখন তিনি বধূকে কাছে ডাকিয়া এটা ওটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; বধূ পূর্ব্বের ন্যায় ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিত, একদিন মোহিনী বললেন—তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলেই পার মলিনা, আমি তাতে কিছু মনে করব না। বধূ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। সায় দিল বটে, কিন্তু ভাশুরের সহিত সে যে কথা কহিবে, এরূপ লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর দাদার আগ্রহাতিশয়ে তাহার স্বামী তাহাকে বলিল —দাদা যখন এত করে বলছেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা কওনা কেন মলিনা? মলিনা বলিল—কইব? স্বামী বলিল—হাঁ, কয়ো।

সেই হইতে মলিনা মোহিনীর সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে মোহিনীর প্রশ্নের জবাবে দু'একটা কথা বলিত। পরে ঘরকন্নার খুঁটিনাটী সম্বন্ধে নিজে গিয়াও তাঁহার কাছে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করিত। অবশেষে সঙ্কোচ যখন একেবারে বিদূরীত হইল, তখন স্বামীর উপস্থিতে

বা অনুপস্থিতিতে ভাশুরের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনাও করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে মাসিক পত্রিকা-পাঠ এবং দু'এক খানা উপন্যাসও উভয়ে মিলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

প্রগতির খাতিরেই হোক্ কি প্রয়োজনের তাগাদাই হোক, বাংলা দেশে দেবর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর—পরে ঘনিষ্ঠতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার পরিণামে বাংলার বহু পরিবারেই যে শান্তি নষ্ট হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে, সেকথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হাসিপরিহাসে স্বাধীনতাকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে অধিকাংশ স্থলেই জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ ও তাহার সমবয়স্ক দেবরের নৈকট্য একেবারে সীমা-রেখায় গিয়া পড়িয়াছে, যেখান হইতে সামান্য একটু এদিক ওদিক্ হইলেই উভয়ের সর্ব্বনাশের মোহগর্ত্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বনাশও যে কোথাও কোথাও না হইয়াছে এরূপ নহে—সর্ব্বনাশের এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনাবশ্যক বোধে নাম-ধাম সহ বিস্তৃত বিবরণী বিবৃত করিলাম না। কিন্তু ভাশুর ভাদ্রবধূর পবিত্র সম্পর্কটীকেও যাঁহারা ঐরূপ পঙ্কিল ও ক্লেদময় করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ না করিয়া পারিলাম না। যতদিন পরস্পরের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ ছিল, ততদিন স্নেহ-শ্রদ্ধার দূরত্ব অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিলনা, কিন্তু ভাশুর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে বাক্যালাপ আজ নাকি দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে; তাই পূর্ব্বাহ্নেই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। দেবর বা ভ্রাতৃবধূর বেলায় সেটুকুও নাই। পূর্ব্বক্ষেত্রে দেবর ও ভ্রাতৃবধূ উভয়কেই মধ্যবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে (অগ্রজ বা স্বামী) সমঝাইয়া চলিতে হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ হইতে অগ্রজের ভয়ের

সম্ভাবনা কম, বধূ ও ভাশুরের অভয়বাণীর উপরে অনেকটা নির্ভরশীল হইতে পারে।

আরও এক কথা। ভাশুর ভ্রাতৃবধূর পরস্পরের সহিত কথা কহিবার এমন কি আবশ্যকতা থাকিতে পারে! যাহা বলিবার তাহা ভাশুর-জায়ায় মধ্যবর্ত্তিতাই বলা যাইতে পারে। অন্যথায় অগ্রজ কনিষ্ঠ সহোদরের কিংবা স্ত্রী স্বামীর সহায়তা লইতে পারেন। স্বামীর নিকটে স্ত্রীর কিংবা কনিষ্ঠের নিকটে জ্যেষ্ঠের যাহা অবক্তব্য, ভাশুরের নিকটে ভাদ্রবধূর অবশ্য অবক্তব্য। বধূরা আজকাল শ্বশুর, খুড়শ্বশুর প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন—ইহা অশোভন নহে। শ্বশুর কিংবা শ্বশুর-পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ পিতৃতুল্য, সম্পর্কে গুরুত্বানুযায়ী তাহাদের নিকটে আবদার পর্য্যন্ত করা চলে। কিন্তু ভাশুর পিতৃ-পর্য্যায়ভুক্ত নহেন, অথচ তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। কথাবার্ত্তা কহিয়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আবদার-বিহীন শ্রদ্ধার সীমা-রেখা অনতিক্রম্য রাখা অতি কঠিন। এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ভাশুর ভাদ্রবধূর মধ্যে আমাদের সমাজের চিরপ্রচলিত দূরত্বটুকু সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া চলা।

মোহিনী ও মলিনা তাহা করেন নাই। করেন নাই বলিয়া তাঁহা-দিগকে এমন পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল যাহা অতি গ্লানিকর, অতীব লজ্জাকর। আমাদের এই আখ্যায়িকা যদি একজনেরও চোখ ফুটাইতে পারে, একটীমাত্র ব্যক্তিরও এই শ্রেণীর ভ্রম-নিরসন করিতে পারে, তবেই আমাদের চেষ্টা স্বার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

বৎসর দুইকাল কলিকাতার বাসায় অবস্থানের পরে মোহিনীর কনিষ্ঠ সহোদর দুরন্ত ব্যাধিতে দেহত্যাগ করেন। তিনটী প্রাণীকে

লইয়া যে সুখনীড় রচিত হইয়াছিল, কালের উতলা বাতাস নির্ম্মমরূপে তাহা ধূলিস্যাৎ করিয়া দিল।

ভ্রাতৃশোকে মোহিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু বিধাতা চির-পরার্থপর তাঁহাকে অবিমিশ্র আত্মসুখ খুঁজিয়া বেড়াইতে সৃষ্টি করেন নাই—আপনার দুঃখ আপনার বুকে চাপিয়া শোক-শয্যায় শয়ান থাকিতে তিনি পারিলেন কৈ, তাঁহার চ'ক্ষের সম্মুখে একটা মর্ম্ম-পীড়িতা পতি-বিরহিনী বধূ নিষাদ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের বিরহিনী বধূর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহাকে সান্ত্বনা দান করা হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। স্বহস্তে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন—স্বামী যে কাহারও চিরদিন থাকে না, পরম আদরের ধনকেও যে মানুষ স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, পরমপ্রিয়কেও একদিন বিস্মৃত হইতে হয়—নূতন করিয়া নিজেকে গড়িয়া লইতে হয়, সেই সকল কথা তিনি বধূকে শুনাইলেন। শুনাইলেন গীতার সেই মহাবাণী—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবাণি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি।
তথা শারীরানি বিহায় জীর্ণা-
ন্যনানি সংযাতি নবানি দেহী॥

সংসারে মানুষকে এক কাপড় ছাড়িয়া আর এক কাপড় পরিতে, এক দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহ ধরিতে হয়; ইহা ছাড়া আর উপায় নাই। বিপদের উপরে বিপদ—বধূর হিষ্টিরিয়া। দিনে রাত্রে কেবলি সে মূর্চ্ছা যায় আর অনন্যোপায় হইয়া মোহিনীকেই গিয়া ধরিতে হয়, অতি যত্নে চৈতন্যসম্পাদন করিয়া ত্রস্ত বেশবাস সংযত করিয়া দিতে হয়। বধূ যখন

সংজ্ঞালাভ করে, দেখে—ভাশুর তাহাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন; কাতর-করুণ মিনতিতে ভাশুরকে কৃতজ্ঞতা জানায়। উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তবে অন্যত্র যায়। আহা—মূর্চ্ছাকালে না-জানি ভাশুরের সে কত লাঞ্ছনারই হেতু হইয়াছে!

এইরূপে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। মোহিনীর অতীব যত্নে মলিনা সুস্থ হইয়া উঠিল। এই ক'মাসে ভাশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। সে স্থির করিল—তাহাকে লইয়া ভাশুর যথেষ্ট করিয়াছেন, এখন ভাশুরকে যাহাতে সুখী করিতে পারে, ভাশুরের ভ্রাতৃ-শোক-সন্তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে যাহাতে সে সান্ত্বনা দিতে পারে, ভাশুরের নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাকে আপনার ঐকান্তিক সেবা দ্বারা যাহাতে সে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে তাহারই জন্য যত্নবতী হইবে।

আবার সে রন্ধন-শালায় গেল, গৃহকর্ম্মের সকল ভার গ্রহণ করিয়া ভাশুরের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য কোন কর্ত্তব্যেই সে ত্রুটী রাখিল না।

তাই বলিয়া কি স্বামীর জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠিত না? স্বামী-সঙ্গ-বিহীন নিঃসঙ্গজীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিত না? স্বামী-বিরহ-বিধুর চিত্ত কি তাহার অন্তঃহৃত স্বামীর সন্ধানে দূরাকাশের পরপারে ঐ মেঘলোকে, ঐ চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রলোকে খুঁজিয়া বেড়াইত না? আহা, তাঁহার ন্যায় অভাগিনী কে! সংসারে যাহা পাইবার তাহা সকলই সে পাইয়াছিল আবার সকলেই হারাইল! অদৃশ্যলোকে বসিয়া দেওয়া-নেওয়ার এই লুকোচুরি খেলেন যিনি সেই বিধাতা না জানি কত নিষ্ঠুর, কত নির্দ্দয়, কত নির্ম্মম!

বধূর জন্য মোহিনীরও উদ্বেগের অবধি ছিল না। নিরাভরণা মলিনার পানে চাহিয়া তাঁহার দরদী হৃদয় শোকাবেগে উদ্বেলিত হইয়া

উঠিত। মলিনার সহিত তিনিও হবিষ্যান্ন ভোজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহা, এ শোকে কি আর সান্ত্বনা আছে! মলিনাকে ডাকিয়া একদিন তিনি বলিলেন—মলিনা, হাত-দু'টী একেবারে খালি করেছ কেন? আমি যে তোমার এ শূন্যতা সহ্য করিতে পারি না। দু'গাছি রুলী আর সরু হারছড়া অন্ততঃ পরে থাক। নিজে গিয়া মলিনার জন্য চওড়া নীলপাড়ের শাড়ী আনিলেন—সেই শাড়ী আর সাদা সেমিজ, সাদা মুগার এম্ব্রয়ডারী করা ব্লাউজ্ তাহাকে পরাইলেন। দৃঢ়স্বরে হুকুম করিলেন—আজ থেকে তোমার হবিষ্য করা চল্‌বে না। দু'জনেই আমরা দু'বেলা পরিষ্কার নিরামিষ খাব।

রাত্রে মোহিনীর ভাল ঘুম হইত না। ঐ এতটুকু বধূ পতি-বিরহে একাকিনী কিরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করিতেছে, সে কথা ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিতেন। আহা, ঐ ঘরখানিই যে উহারা দুইজনে আনন্দ-নিকেতন করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার অনিদ্রা রোগ বহু-দিনের—গরমে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে গভীর রাত্রে তিনি যখন শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতেন, তখনও অনুভব করিতেন উহারা জাগিয়া আছে, মধুরালাপে সুখময় নিশা যাপন করিতেছে। আর আজ! আজও বধূ সেই একই গৃহে, একই শয্যায়। পার্থক্যের মধ্যে এই যে সেদিন আনন্দদান করিবার জন্য প্রাণঢালা ভালবাসা লইয়া যে নয়নানন্দ সঙ্গিটী বধূর পার্শ্বে বিরাজ করিত, আজ সে নাই! যৌবনের প্রেমোপচার গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে যে তাহাকে পরম পরিতৃপ্তি দান করিত, আজ সে অনুপস্থিত। আহা, সে জীবন-সর্ব্বস্ব সঙ্গিটীর অভাব মলিনাকে আজ কত না পীড়িত করিতেছে!

কিন্তু বিধাতার বিরূপতা ব্যর্থ করিয়া তাঁহার আমোঘলিপি

পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, মানুষের এমন কি ক্ষমতা আছে? মানুষ কি করিতে পারে—কতটুকু ক্ষমতা তাহার—বিধির বিধানের উপরে কতখানি তাহার হাত আছে! জীবন-যৌবনের সর্ব্বসুখ সর্ব্বভোগবঞ্চিতা মলিনার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করিয়া সাফল্যে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা যদি মোহিনীর থাকিত! এ ঘর হইতেই তিনি অনুভব করিতে পারেন—অভাগিনী এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। আহা, জীবন দিয়াও যদি উহার এই দুঃখ ঘুচাইতে পারেন, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না—মোহিনী মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

মোহিনী মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন—মলিনা যদি মনের ব্যথা মনেই সঞ্চয় করিয়া রাখে, আপন শোকে আপন মনে গুম্‌রাইয়া মরে, তাহা হইলে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা অসম্ভব। অবশ্য সাধারণ হিন্দু-বিধবার ন্যায় ব্যাক্‌ওয়ার্ড সে নহে; মোহিনীর চেষ্টাতেই কতকটা পরিমাণে ফরওয়ার্ড হইয়াছে। কিন্তু আরও অগ্রগামিনী না হইলে তাহাকে নিজের সঙ্কল্পিত পথে পরিচালিত করিয়া তুলিতে তিনি পারিবেন না। মলিনার ভাবীজীবন সম্বন্ধে যে আদর্শ মোহিনী নিজের মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে তদনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলনে আরও অনেকটা স্বাধীনা ও প্রগতি-সম্পন্না করিয়া তুলিতে হইবে।

এ জন্য প্রগতিপ্রাপ্তা মহলে তাহাকে পরিচিত করিয়া দিতে হইবে, অগ্রগামিনী রমণীদের সঙ্গে সহজভাবে ও নিঃসঙ্কোচে মিশিতে হইবে। এই সকল কারণেই মলিনাকে তিনি লরেটো স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সকাল ৯টা ৯।৷৹টায় স্কুলের গাড়ী আসিয়া মলিনাকে লইয়া যায়, অপরাহ্নে ফিরাইয়া দেয়। সকাল সন্ধ্যায় মলিনাকে পড়াশুনা করিতে

হয়। এ অবস্থায় স্বহস্তে রান্না করিয়া পড়াশুনা করা অসম্ভব, তাই ভৃত্যকে দিয়া রান্না করাইতে হয়। আচারের কড়াকড়ি মলিনার পূর্ব্ব হইতেই ছিল না; যেটুকু ছিল তাহাও এইবারে ঘুচিল। একাদশীর দিনও স্কুল করিতে হয় বলিয়া একাদশীর বালাই তুলিয়া দিতে হইল। সবই যদি গেল, তাহা হইলে নিরামিষ ভোজনটাই বা কেন থাকিবে? বিশেষতঃ নিরামিষ ভোজনে মস্তিষ্কের শক্তি নাকি কমিয়া যায়, মস্তিষ্ক-চালনার ক্লেশ পোষাইয়া লইবার মত বলও শরীরে থাকে না—তাই মলিনাকে মৎস্য-মাংস ধরিতে হইল।

ভ্রাতার মৃত্যুতে সংসারের অনেক ভারই লাঘব হইয়াছিল; তাই মোহিনী সন্ধ্যার টিউসনী ছাড়িয়া দিলেন। স্কুল হইতে ফিরিয়া চা-ডিমসিদ্ধ খাইয়া মলিনাকে লইয়া তিনি কখনও পদব্রজে, কখনও বাস-ট্রামে বেড়াইতে যাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা বেলাটা গড়ের মাঠে, কার্জ্জন পার্কে কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সম্মুখে কাটাইয়া দিয়া একটু রাত করিয়াই তাহারা বাসায় ফিরিতেন। ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া মলিনাকে পড়াইতে বসিতেন। পড়াইতে পড়াইতে রাত্রি বেশী হইয়া যাইত—মলিনাকে নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া মোহিনী শয়ন করিতে যাইতেন।

পড়াশুনার দরুণ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মলিনার একটী নূতন ব্যাধি দেখা গেল—রাত্রে পড়িতে পড়িতে তাহার বুকে ব্যথা ধরিত। ব্যথাটী যে কিসের তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না বটে, কিন্তু এ ব্যথায় সে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িত। মোহিনী ডাক্তার আনিতে চাহিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে দিয়া বুকের ব্যথার কারণ পরীক্ষা করিতে মলিনা আপত্তি করিল। মোহিনী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার সে আপত্তি ঘুচাইতে পারিলেন না। অগত্যা

বন্ধুদের কাছ হইতে ডাক্তারী বই আনিয়া পড়িয়া মোহিনী নিজেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

মোহিনীর সযত্ন চিকিৎসায় মলিনার বুকের ব্যথার উপশম হইল বটে, কিন্তু তাহার শরীর আর সারিল না। মোহিনী স্পষ্ট অনুভব করিলেন—দিনে দিনে মলিনা অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। এক একদিন বমি করিয়া আসিয়া না খাইয়াই সে শুইয়া পড়িত, কিছুতেই আর মাথা তুলিতে পারিত না। স্কুলের বালাই দূর হইল, বাড়ীর পড়াশুনাও লোপ পাইল। মোহিনী প্রমাদ গণিলেন।

দুইজনে অনেক পরামর্শ করিয়া শেষে বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হওয়াই ঠিক হইল। মলিনাকে লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেলেন।

সুস্থ হইল বটে; কিন্তু মলিনার মধ্যে এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাহার মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিল। মোহিনীকে সে স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে এভাবে সে আর বেশীদিন থাকিতে পারিবে না। মোহিনী যদি তাহার একটা ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে যেদিকে পারে চলিয়া যাইবে। তাহার আবেগপ্লুত হৃদয় একান্তভাবে যাহা কামনা করিতেছিল, পুণ্যধাম বারানসীতে গিয়া তাহাই নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বুভুক্ষু নারী-হৃদয়ের আশা-কামনার প্রতিরূপ একখানি অপরিণত মূর্ত্তি মলিনার স্মৃতিকে পীড়িত করিতে লাগিল। সকাম হইয়াও যাহারা ফলভোগ হইতে আপনাদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখে, মলিনা সে শ্রেণীর মেয়ে নহে। সে চায় নারীজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি—জীবন পুষ্পকে সে চায় মুকুলিত দেখিতে। একথা সে মোহিনীকে মুখ ফুটিয়া বলিল। নিরুপায় হইয়া মোহিনী মত পরিবর্ত্তন করিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া মোহিনী নূতন বাসা করিলেন—অতীতকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া নূতন করিয়া নিজকে গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিছু টাকা লইয়া নিজেই সওদায় বাহির হইয়া তিনি কয়েক জোড়া লালপেড়ে শাড়ী ও ধুতী, শঙ্খবলয়, সিঁদুর সিঁদুরকৌটা, সোলার সজ্জা প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। আনিয়া মলিনার হাতে দিয়া বলিলেন—মলিনা, এইগুলি রাখিয়া দাও। মলিনা জিনিষগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—তাহলে এবারে সুমতি হল তোমার? কিন্তু পাঁজী দেখেছে, পুরুত কাউকে বলেছ?" মোহিনী জানাইলেন যে তিনি সব ঠিক করিয়াছেন, কিছুই বাকী রাখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় বিধবা বিবাহের সাহায্যকারী সমিতি হইতে সম্প্রদান জন্য পুরোহিত, যাজ্ঞিক, বরযাত্র হইবার জন্য সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ—এমন কি স্ত্রী-আচার জন্য কয়েকজন মহিলাও আসিলেন।

বর গিয়া বিবাহ-বাসরে বসিলেন। মহিলারা কন্যাকে লাল চেলী পরাইয়া অত্যাবশ্যকীয় প্রসাধনাদি করাইয়াদিলেন। বিবাহ-বাসরে যাইবার জন্য কন্যার যখন ডাক পড়িল, তখন নিজের ঘরে গিয়া মলিনা দেয়ালে-টাঙ্গানো ফটোচিত্রের সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল। করজোড়ে বলিতে লাগিল—প্রভু তোমার দাদাকে তুমি বড়ই ভালবাসিতে। দাদার শান্তিহীন জীবনে শান্তিদান করিবার জন্য আমাকে কতপ্রকার উপদেশ দিতে। আমি আজ তোমার সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চলিতেছি, অন্তরীক্ষ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহা পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়া তোমার অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্তি দান করিতে পারি।

আমরা শুনিয়াছি মোহিনীর বন্ধুগণের কেহ কেহ বিবাহের দিন

ফটোখানি সরাইয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন, মোহিনী নিজেই তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—মলিনার জন্য ভাইটীর উদ্বেগ কম ছিল না। মলিনার একটা গতি করিবার জন্য মৃত্যুকালে সে আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতেছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি আজ ওর সে অনুরোধ পালন করিতে চলিতেছি, ঐ ছবিতে আবির্ভূত হইয়া ও স্বচক্ষে দেখুক—ওর অসম্পূর্ণ কাজ আমাদ্বারা সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

বিবাহ হইয়াগেল—গোত্রান্তর ব্যতিরেকে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারই নিষ্পন্ন হইল। স্ত্রী-আচার কালে মোহিনী ও মলিনা প্রফুল্লচিত্তেই তাহাতে যোগ দিলেন। কুশণ্ডিকা ও বাসি বিবাহ হইয়া গেল। বাসি বিবাহের দিনই বাড়ী খালি হইল। পুষ্পশয্যার রাত্রে মলিনা স্বহস্তে শয্যারনা করিল। বহুদিন পরে বৈধ মিলন-শয্যা রচনা করিতে করিতে তাহার চ'ক্ষে এককোঁটা অশ্রু দেখা দিল। বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমাজ্জনা করিয়া সে মনে মনে কহিল—আমি একি করিতেছি! প্রাতঃস্মরণীয়া তারা মন্দোদরীর ন্যায় বিবাহ-সভায় নূতন করিয়া যাহার হাতে নিজকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, অপর পুরুষের চিন্তাদ্বারা তাহার প্রতি একি বিশ্বাসঘাতকতা। ভগবান, আমার চিত্তে বল দাও—নূতন প্রেরণায় পুরাতনকে বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা প্রদান কর।

মোহিনী বৌবাজার হইতে কিছু ফুল ও দুইছড়া বেলের মালা কিনিয়া আনিয়াছিলেন—ফুলগুলি নিজে শয্যায় বিছাইয়া দিলেন। সন্ধ্যা রাত্রেই কাজ সারিয়া শাঁখা-সিঁদুর শোভিতা চেলী-পরা মলিনা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল; হাতে ধরিয়া মোহিনী তাহাকে আনিয়া বিছানায় বসাইলেন। তারপর একটী মালা তাহার হাতে দিয়া অপরটী তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন। মলিনাও স্বামীর গলায়

মাল্যদান করিল। নব-স্বামীর কণ্ঠে মাল্যদান করিয়া বৈধব্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ উপভোগ করিল।

সেরাত্রি দু'জনের কেমনে কাটিয়াছিল জানি না। নিজের অভিজ্ঞতা ভিন্ন যদি অপরের অবস্থা অনুভব না করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে বোধ করি একটা দম্পতিও নাই যাহারা এই অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব দম্পতির মিলন-মাধুর্য্য অনুমান করিতে সক্ষম হইবে। ফুলশয্যা-রাত্রির মিলন-মধু মলিনা একদিন অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছিল—পান করিয়া বুক ভরিয়া রাখিয়াছিল। অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে সে মধু-ভরা বক্ষ তাহার শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল—মোহিণীর মোহন-স্পর্শে আবার তাহা বাসনা-শোণিতে চঞ্চল হইয়াছে, সুরভিধারায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সব হারাইয়া মলিনা আজ সব পাইয়াছে আর পাইয়াছে তাহারই কাছে যৌবনের প্রথমোন্মেষে—বিবাহিতা জীবনে অভিজ্ঞতালাভের প্রথমাবধিই যাহাকে শ্রদ্ধাভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিল। প্রেমের অভিজ্ঞতা সকল নারীই একদিন না একদিন লাভ করে; কিন্তু শ্রদ্ধা যেখানে ক্রমাভিব্যক্তিতে প্রেমে পরিণত হয়, প্রেমের সে পরম বৈচিত্র্যের সন্ধান লাভ ক'জন নারীর ভাগ্যে ঘটে?

আর মোহিনী? মলিনার ন্যায় বিবাহিত-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার দ্বিতীয়বার ঘটে নাই। চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী অধিক বয়সে অধিক পরিপক্কতা লাভের পরে এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে নূতনতর রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অভিজ্ঞাতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আজ নূতন আনন্দ—চিত্তজয়ের আত্মপ্রসাদ। যে নারী আজ তাহার সমস্ত যৌবনসম্ভার লইয়া তাঁহার কাছে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে, তিনি নিজেই সেই নারীর চিত্ত তিলে তিলে জয়

করিয়াছেন,—বিধাতার পরিহাস, সম্পর্কের পার্থক্যে যাহাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে বহুদূরে রাখিয়া দিয়াছিল। চিত্তজয়ের গৌরব সামান্য নহে—অতখানি দূরত্ব লঙ্ঘন করিবার গৌরব সাম্রাজ্যবিজয়ের গৌরব অপেক্ষাও অধিক।

মীরা ঠাকুর — নগেন্দ্র গাঙ্গুলী

মায়া রায় — নির্ম্মল ব্যানার্জ্জী

মায়া রায় + নগেন্দ্র গাঙ্গুলী

"প্রেম এসেছিল, চ'লে গেল সেযে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকী আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে হবে চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন গৃহহীন
গ্রহ-তারকার পথে।

"ততকাল আমি একা বসি রব খুলি দ্বার
কাজ করি লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।
পূজা আয়োজন সব সারা হবে একদিন
প্রস্তুত হয়ে রব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু দু'টী সেই গৃহহীন
অতিথিরে সাথে লব।

"যেজন আজিকে ছেড়ে গেল খুলি গৃহদ্বার
সে বলে গেল ডাকি',
মোছো আঁখিজল আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকী।
সেই বলে গেল গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি',
নবগৃহ মাঝে বহি' এনো তুমি গৃহহীন
পূর্ণ মালিকাগাছি॥"

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিষ্টার নির্ম্মল ব্যানার্জ্জীর পত্নী—বিখ্যাত ব্যারীষ্টার মিষ্টার রজত রায়ের ভগ্নী মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জী ভ্রাতৃগৃহে বসিয়া এবং ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়তমা দুহিতা শ্রীমতী মীরা দেবীর স্বামী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী স্বগৃহে বসিয়া একই দিনে একই মুহূর্ত্তে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত উপরোক্ত কবিতাটী সম্ভবতঃ পাঠ করিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—আহা, আমার জীবনে কবে এমন দিন আসিবে যেদিন পুরাতনের সদ্যঃবিচ্ছেদজনিত অভাব পূর্ণ করিতে নবাগত অতিথি আসিয়া দেখা দিবে!

রবীন্দ্রনাথ নব-যুগের নব-প্রগতির মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি আজ যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, প্রগতিপ্রভাবে কাল তাহা বাস্তবরূপে দেখা দেয়—একথা তাঁহার মন্ত্র-প্রভাবে প্রভাবান্বিতা বহু নরনারীর, এমন কি মায়া দেবীর এবং তাঁহারাই জামাতা নগেন্দ্র গাঙ্গুলীরও বোধ হয় জানা ছিল। তাই সুদূর ব্যবধানে থাকিয়াও উপরোক্ত কবিতা পাঠে

দু'জনারই অন্তরের অন্তস্থল হইতে একটী মাত্র বাণী হয়তো উত্থাপিত হইয়া থাকিবে—

"মোছো আঁখিজল আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকী।"

তাহাতে সন্দেহ কি?

(অন্তরা এক)

স্বনামধন্য মিঃ আর এন রায়ের কন্যা—সুপ্রসিদ্ধ ব্যারীষ্টার মিঃ রজত রায়ের ভগ্নী মিস্ মায়া রায় বিবাহিতা হইয়াছিলেন উদীয়মান ব্যারীষ্টার নির্ম্মল ব্যানার্জ্জীর সহিত। উদ্বাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল ম্যারেজ এক্ট অনুসারে—বিবাহের পূর্ব্বেই মিঃ ব্যানার্জ্জীর সহিত মিস্ রায়ের পরিচয়লাভ ঘটিয়াছিল। "হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন" বলিয়া কবিরা যাহাকে আখ্যাত করেন এবং "দেহমনে খাপ খাওয়াইয়া মিলন বলিয়া অতি আধুনিক সাহিত্য-দরদীরা যাহাকে ব্যাখাত করিয়াছেন, বোধ হয় এ মিলন ছিল ঠিক সেই মিলন। কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে ধূল-পরিমাণ হওয়ায় সেই ধূলে যে অনেক সময়ে চোখ আচ্ছন্ন করিয়া ভুল হইয়া বসে এবং বেখাপ্পা হইয়া উঠে, প্রণয়ী-যুগলের কেহ সম্ভবতঃ সে কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রেম-চর্চ্চা বা কোর্টসিপ্ আর যাহাই হৌক "ফ্রী লভ্" তো বটে; আর সেই "ফ্রী লভ্"কে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলে হয় "বিনামূল্যে ভালবাসা"। পণকে-পণ কড়ি দিয়া যাহা কেনা হয়, তাহাই অনেক সময়ে মেকী বা অচল হইয়া দেখা দেয়, এতো কানাকড়ির জিনিষ। তাই প্রথম-যৌবনের স্বপ্ন-ঘোরে যাহাই

মনে হোক, বাস্তব জীবনে ওজিনিষটা একেবারে অচল। প্রেম করা মানে যাচাই করা নহে, চোখ বুঁজিয়া পা ফেলা। প্রেমের দেবতাটার মত প্রেমিকও অন্ধ—কাণার পা খানায়ই পড়িয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সেই চিরন্তন রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল না। স্বপ্ন যখন কাটিয়া গেল, মায়া-নির্ম্মল উভয়েই উভয়ের সঙ্গ পরিহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। "আদিম অসভ্য" যুগে স্বামী-স্ত্রীর যদি ছাড়াছাড়ি হইত, দেখা যাইত স্বামীই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কালধর্ম্ম এযুগে স্ত্রীকে কেবল "Fair sex" বলিয়াই আখ্যাত করে নাই, কার্য্যতঃ "stronger sex" বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে—"sweeter heart" পদবী দ্বারাও কামিনী-কৌলিন্য স্বীকার করা হইয়াছে।

যথারীতি ডাইভোর্স হইয়া গেল। ডাইভোর্সের মুখ্য কারণ অরুচি; গৌণ কারণ যাহা, তাহা না হয় নাই লিখিলাম। সমাজে মায়া দেবীর যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি। গতপূর্ব্ব কর্পোরেশন-নির্ব্বাচনে তিনি "সিটি ফাদার" হইবার জন্য প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন—কেবল করদাতাগণের বে-আক্কেলীর দরুণ হইতে পারেন নাই। হায় অবোধ কলিকাতার নাগরিক! ডাইভোর্সে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের যে অপরিসীম বীরত্ব, তাহার মর্য্যাদা দিতে পারিলে না! যদি ইহার মর্য্যাদা বুঝিতে, তাহা হইলে স্বামীরূপ সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রীযুক্তা মায়া দেবীকে সে মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হইতে না!

"এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হ'য়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।"

—রবীন্দ্রনাথ

(অন্তরা দুই)

ওদিকে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা মীরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। ঠাকুর পরিবারের ন্যায় গাঙ্গুলী-গোষ্ঠীও প্রগতি-যুগের অগ্রগামী। এই পরিবারেরই কন্যা শ্রীযুত নগেন্দ্র গাঙ্গুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অরুণা গাঙ্গুলী দিল্লীর ব্যারীষ্টার মিঃ আসফ আলীকে বিবাহ করিয়া প্রগতির চরম নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী মীরা ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ঋষি-কন্যা শকুন্তলার ন্যায় ঋষি-কন্যা মীরারও চরিত্র বৈচিত্র্যের রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল বৈকি! পিতৃ-রচিত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলী যে কন্যা ভাল করিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ পিতৃভক্ত কন্যার মত পিতার আদর্শে-ই আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। মীরার সম্মুখে নারী-জীবনের যুগ-সম্মত যে আদর্শ প্রসারিত ছিল, রবীন্দ্রনাথের রচিত যুগশাস্ত্র হইতে আমরা তাহা দেশের অপরাপর আধুনিকাগণের অনুসরণ জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিকারা যেন—

> "ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেস্‌ওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, সাড়িটা গায়ে তির্য্যগ ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপটান। এরা খুট্‌খুট্‌ করে দ্রুত চলে, উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপী রেশমের পাখা

ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর্‌ফুর ক'রে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্দ্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জ্জন প্রকাশ করে থাকে।"

* * * *

"চালচলন কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা,—বিলাতী কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালী মেয়ের দীর্ঘকেশ গৌরবের গর্ব্বের প্রতি গর্ব্ব সহকারেই দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির ল্যাজের মত বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এলামেলা করা। জীবনের আগুলীলায় কালো চোখের ভাবটা ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে ত লক্ষ্যই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁট দু'টীতে সরল মাধুর্য্য ছিল, এখন বার-বার বেঁকে বেঁকে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মোটের উপর চোখে পড়ে একটা পাৎলা সাপের খোলসের মতো ফুর্‌ফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আস্‌ছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনও কখনও টেবিলে, কখনও চৌকির হাতায়, কখনও পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গীতে আলগোচে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তার উদ্রেগ করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওয়ালা জুত-জোড়ার

কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগল জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পয়ের গড়ন দেবার বেলায় ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভুত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটী সংশোধন করা হয়।”

রবীন্দ্রনাথ

পিতার অঙ্কিত আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে মীরা কতদূর সক্ষম হইয়াছিলেন বলিতে পারি না, তবে তিনি যে যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা নহেন, এমন কথা বিশ্বাস করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না।

অল্প বয়সেই মীরার মাতৃ-বিয়োগ হয়। পত্নী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের যে এক বিপ্লবমূলক পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করা চলে না, কারণ—কবির পত্নী-বিয়োগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ও পরবর্ত্তী কালের কাব্যসমূহের মধ্যে আমরা আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল, মানসী, কল্পনা, ছবি ও গান সর্ব্বশেষে চিত্রা—এইগুলি পত্নী-বিয়োগের পূর্ব্বকার রচনা। এই গ্রন্থগুলিতে আর যাহাই থাকুক, বাস্তবকে বিকৃত করিয়া ধোঁয়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। সোণার তরী ও খেয়া বিয়োগ-সন্তপ্ত হৃদয়ের প্রথামাবেগপ্লুত। কবি এখানে ভারত-ভারতীকে বিশ্বের বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বভারতীতে পরিণত করিতে সমুদ্র পাড়ি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রাচ্যের আত্মস্থ কবি পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সেবিত শান্তি-নিকেতন এই সময়েই বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়।

ভারতের অন্যান্য কবিগণের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ এই এক বিষয়ে অধিকতর ভাগ্যবান যে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রসার ও কবিত্ব-মহিমার প্রচার দুইই অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে হইয়াছে—কোথাও এক বিন্দু

বাধা পায় নাই। এই প্রসার ও প্রচারের মূলকেন্দ্র শান্তিনিকেতনের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, শাল-তমালাদি বনস্পতি ও কুসুম-কুঞ্জ-শোভিত উপবন, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের ধূলি-কঙ্করময় রক্তিমাভা, বর্ষণ-বিরল মেঘ-মুক্ত আকাশের নীলিমা যেমন কবি-কল্পনাকে শ্বেত-বলাকারই মত ভাসিয়া বেড়াইবার অবকাশ দিয়াছে,—তেমনি ভক্তিমুগ্ধ সেবক-সেবিকার অপরিসীম "গুরুদেব"-প্রীতি, চারণ-চারণী-সঙ্ঘের স্তুতিগান, গুরু-পল্লীর সদা-জাগ্রত প্রচার-কার্য্য ও কর্ম্মসচিবগণের অক্লান্ত অদম্য পাবলিসিটী-তৎপরতা কবিবরের কবিখ্যাতিকে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বহন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়া কবিত্ব-সূর্য্যের এক বর্ণকে ভক্তি-বাষ্পে সপ্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখে। আলো-ছায়ার মিলন-ক্ষণে গোধূলি-লগ্নে কবিবর নীলাভ আলোকে বহুমূল্য আরাম-কৌচে বসিয়া যে গানটী একখণ্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন, পরমুহূর্ত্তেই দীনু (সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আসিয়া সে সঙ্গীতটীর প্রতিলিপি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া যান—সঙ্গে সঙ্গে কবি গুণ গুণ করিয়া ঐ গানের সুরের একটু আভাষ তাঁহাকে দেন। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত-ভবনে গানের যে মজলিস বসে, দীনেন্দ্রনাথ সেই মজলিসে গানটী সকলকে গাহিয়া শুনান—ভক্তিমান গীতি-সাধক ও ভক্তিমতী গীতি-সাধিকারা সঙ্গে সঙ্গে সুর আয়ত্ত করিয়া লন, অনুলিপি লইয়া রাত জাগিয়া গীতি-কলিগুলি কণ্ঠস্থ করেন। পরদিন প্রত্যুষে স্নান-সমাপনান্তে সুবেশ-সজ্জিত কবি যখন তাঁহার শান্তিনিকেতনস্থ বিখ্যাত বাস-ভবন দক্ষিণায়নের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান, প্রভাত-মন্দ-সমীরণের প্রথম স্পর্শ তাঁহার রেশম-সূত্র-নিন্দিত দাড়িতেই শুধু কম্পন আনে না, ঔৎসুক্য-চকিত শ্রবণেও চারণী-দল-মুখ-নিসৃতঃ গীতি-লহরীতেও পূর্ব্ব-গোধূলিতে রচিত গীতি-কলির সুর-শিহরণ লইয়া আসে। যে সকল

অনুরাগী শিষ্য ও অনুরাগিনী শিষ্যার দল কলিকাতা হইতে শান্তি-নিকেতনে নিত্য যাতায়াত করেন, তাঁহারা হয়তো ইতিমধ্যে কবি-দত্ত সুরলয় সহকারে উক্ত সঙ্গীত-কলিটী কলিকাতায় আনিয়া সুনির্দ্দিষ্ট ভক্তমহলে উহার প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—শান্তি-নিকেতন হইতে জোড়াশাঁকো এবং জোড়াশাঁকো হইতে সঙ্গীত-সঙ্ঘ পর্য্যন্ত প্রচার ঘটিতে চব্বিশ ঘন্টার বেশী সময় লাগে নাই, ইহা নিশ্চিত। মাসান্তে যখন কাঞ্চন-কৌলিন্যে গৌরবান্বিত হইয়া সঙ্গীতটী প্রবাসী কিংবা বিচিত্রার মারফতে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তখন উহার সুর-ঝঙ্কার যে দেশের অভিজাত-মহলে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই!

কেবল সঙ্গীতই নহে। কবির নাট্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীমহলে উহার মহলা আরম্ভ হইয়া যায়, রচনা শেষ হইতে হইতে মহলাও শেষ হইয়া আসে—সুনির্দ্দিষ্ট মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিতগণের সম্মুখে ঐ নাটকের অভিনয় হয়, গ্রন্থ-প্রকাশের বহু পূর্ব্বে প্রশংসা প্রকাশ হয়। অপরাপর রচনাও প্রথমে দক্ষিণায়ন প্রাঙ্গনে কিংবা আম্রকুঞ্জে পঠিত ও প্রশংসিত—পরে সাধারণ সমীপে প্রচারিত হয়। প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনের মহান আদর্শ যতই অত্যুজ্জ্বলবর্ণে অনুরঞ্জিত হৌক্, বিশ্ব-ভারতী যে বিশ্বের বাজারে কবি-ভারতীরই প্রচার-সূত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক কথায় বলিতে গেলে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার সাধন-ক্ষেত্র, কবি-মহিমার প্রচার-যন্ত্র। সেখানকার আকাশ কাব্যাকাশ, বাতাস কাব্য হিল্লোল, সেখানকার ফুল রবি-কবির কাব্য-বর্ণে রঞ্জিত—সেখানকার পাখী পর্য্যন্ত রবিঠাকুরের ছন্দে গান গায়। শান্তিনিকেতনের ছেলে মেয়েরা ফার্ষ্ট বুক শেষ করিতে না করিতে

পলাতকার সুর ধরে—ভগ্নাংশে ভগ্নহৃদয় হইয়া সোনার তরীতে গা ভাসাইয়া দেয়। সে এক স্বতন্ত্র জগৎ এই বাস্তব জগৎ, হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একেবারে বিচ্ছিন্ন।

এই আশ্রমের সম্যক্ পরিচয় আমরা দিতে পারিব না; তাই আই-সি-এস্ কবি ও সাহিত্যিক, ঢাকার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুত অন্নদা শঙ্কর রায় ১৩৩৬ সনের ফাল্গুন মাসের বিচিত্রায় শান্তিনিকেতনের বর্ণনা দিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণকে সেইটুকু উপহার দিলাম :—

"সেকালে নালন্দা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুরুষদের ছিল, তাই ভারতবর্ষের চিত্তকে তাঁরা অধিকার করতে পারেন নি! শান্তিনিকেতনের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদেরকে প্রথম থেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অঙ্গ জ্ঞান করা হয়েছে। ক্রমশঃ তাঁদের নিয়ে গুরুপল্লী গড়ে ওঠে। তারপর শিষ্যানীদের দ্বার খুলে দেওয়া হয়! স্ত্রীশক্তির অনুকূল্য না পেলে কোনো বড় জিনিষ বাড়তে পারে না। স্ত্রীরা কিছু করুন আর না করুন, কেবল মাত্র উপস্থিত থাকলেও পুরুষ কাজ করবার দম পায়! স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কীর্ত্তি হ'য়ে শান্তিনিকেতন সরস হ'য়ে উঠেছে।"

কবি-কন্যা মীরা প্রথম-প্রণয়-সম্মোহে স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ডাঙ্গাস্থিত শফরীর মত উদ্বেগাকুল হইয়া উঠেন নাই।

মীরা বহুদিবস দাম্পত্যজীবন যাপন করিয়াছিলেন। স্বামী তাঁহাকে স্বাধীনতার পর্য্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়াছিলেন বলিয়াই কবিদুহিতার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আবদ্ধ জলাশয়ের মাছ জলে

খেলিয়াও যেমন সুখ পায়না—কেমন যেন একটা অবসাদ আসে, হয়তো মীরার জীবনেও সেরূপ অবসাদ আসিল।

দুই নৌকায় পা রাখিয়া থাকা চলে না। স্বামী-গৃহ আর শান্তি-নিকেতন জীবনের এই দু'ধারা হয়তো মীরাকে সুখী করিতে পারিল না; একটীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটানো অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্যা—কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীকে ছাড়েন। মীরা সেই ঠাকুর পরিবারের কন্যা, যে পরিবারের মেয়েরা সাধারণতঃ অন্তরের তাগাদা ভিন্ন বিবাহ করেন না। যে স্বামীকে স্বেচ্ছায় তিনি বরণ করিয়াছেন, সেই স্বামীর সহিত বিচ্ছেদে অগ্রণী হওয়া তাঁহার ন্যায় ঋষি-কন্যার পক্ষে অসম্ভব। আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া ভ্রম প্রমাদ ভাষা-ক্ষেত্রে চলিতে পারে, কিন্তু আর্ষ-কন্যার ভ্রম সমাজ-ক্ষেত্র মানিবে না। অন্যদিকে শান্তি-নিকেতনের সহিত তিনি এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে আশ্রম ছাড়িয়া "পাদমেকং" যাওয়াও তাঁহার পক্ষে (আশ্রমের পক্ষেও বটে) কল্পনাতীত। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল।

মানুষের সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। শরীরের অবরোধ মানুষ সহিতে পারে, কিন্তু মনের অবরোধ সহ্য করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। নারী যতই সহনশীলা হোন, মানসিক অবরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেনই। "ঘরে বাইরে"র বিমলা এমনি বিদ্রোহ করিয়াছিল, নিখিল তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইতে পারে নাই—নষ্টনীড়ের চারু বিদ্রোহ করিয়াছিল, ভূপতি তাহাকে আয়ত্তে রাখিতে পারে নাই—অমন যে চোখের বালির আশা, সেও বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল! স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী-বিদ্রোহের এইরূপ বহু নিদর্শন মীরা পিতার রচিত পুস্তকগুলিতেই পাইয়াছিলেন, তাই হয়তো তিনি শান্তিনিকেতনে বাসই সাব্যস্ত করিলেন।

মীরা ঋষি-কন্যা এবং আশ্রমে পালিতা। তবে তাঁহার পিতাও একালের ঋষি, যে আশ্রমে তিনি পালিতা হইয়াছেন সে আশ্রমও একালের আশ্রম। সেকালের ঋষিকন্যা হইলে অনসূয়া প্রিয়ম্বদার নিকটে সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতৃ সমীপে গার্হস্থ্যধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তাঁহাকে পতিগৃহে যাত্রা করিতে হইত। যাইবার সময়ে বড়জোর মাধবী-লতার কানে কানে প্রণয়বার্ত্তা জানাইয়া, চ্যুত-মঞ্জরীকে বিদায় চুম্বন দিয়া, আশ্রমমৃগীর কণ্ঠকণ্ডুয়ন করিয়া যাইতেন, কিন্তু একালের আশ্রম শান্তিনিকেতনের সবগুলি আকর্ষণই সজীব। কলা-ভবনের ধূমায়িত কারু কারুণ্য, সঙ্গীত-ভবনের তরঙ্গায়িত গীতি-ঝঙ্কার, ছাত্রী-নিবাসের বান্ধবী ও ছাত্র-নিবাসের বান্ধবদল, গুরু পল্লীর সস্নেহ আবেদন, শ্রীনিকেতনের কর্ম্ম-সৌখীনতা, আম্রকুঞ্জের মাধুরীপুঞ্জ, পারুলডাঙ্গার সৌন্দর্য্যশ্রী, য়ুরোপীয় সূপাগারের কুক্কুট-মাংস-সুরভী, সর্ব্বোপরি দক্ষিণায়নের বিরহ-বিকম্পিত দক্ষিণ বায়ু—এ আবেদন, এ প্রেরণা, এ দাবী উপেক্ষা করা সহজ নহে। শান্তি বস্তুটীকে লোকে নানাভাবে ব্যাখ্যাত করে, সুতরাং শান্তি-নিকেতন যে অবিমিশ্র শান্তিরই নিকেতন, শব্দতত্ত্বানুসরণে একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। তবে যে স্থান চৈতন্যকে মাদকতা এবং ভগবানকে স্বপ্নে পরিণত করে, "পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে পাখীর ডাকে জেগে" নাহোক "চারণগানে ঘুমিয়ে চারণ-গানে জেগে ওঠে" যেস্থানের আদর্শ, সেস্থানটী অন্ততঃ সুখ-নিকেতন বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য।

এই সুখ-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া মীরা যদি শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে রাজী না হইয়া থাকেন, বনের পাখী যদি খাঁচায় আবদ্ধ হইতে অসম্মতই হইয়া থাকে তো তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করি কি করিয়া ?

মীরা হয়তো বুঝিলেন আশ্রমের বাহিরে বাস করা তাঁহার পক্ষে

অসম্ভব, নগেন্দ্র গাঙ্গুলীও হয়তো তেমনি বুঝিলেন কর্ম্মবহুল জীবনের ব্যস্ত ও বিস্তৃত কর্ম্মকেন্দ্র হইতে আপনাকে কক্ষচ্যুত করিয়া লইয়া পত্নীর সহিত আশ্রমবাস তাঁহার পক্ষেও সম্ভবপর নহে।

এই খানেই নগেন্দ্রনাথ ভুল করিলেন। কালের সহিত তাল মিশাইয়া চলা তাঁহার উচিত ছিল—বুঝা উচিত ছিল, কালপ্রভাবে পতি-ব্রত পত্ন-ব্রতে পরিণত হইয়াছে। নারীই এযুগের ইঞ্জিন. পুরুষ তাহার বাহিত গাধাবোট মাত্র। এ যুগের শকুন্তলা পতিগৃহ-যাত্রা করে না, এ যুগের দুষ্মন্তেরাই পত্নীগৃহ-যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ যদি এইটুকু বুঝিতেন, বুঝিয়া ব্যবসা ছাড়িয়া কাব্যালোচনার কর্ম্মকেন্দ্র ছাড়িয়া ভাবকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইতেন, কলিকাতার কর্ম্মবাহুল্য হইতে শান্তিনিকেতনের ভাববাহুল্যে আত্ম-সমাহিত হইতেন, তাহা হইলে হয়তো আর গোল হইত না।

কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। বরং সেকেলে আদর্শ অনুসারে পত্নীর নিকটে পাতিব্রত্যের দাবী করিলেন। ওদিকে মীরাও পিতার—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ক্রোধ যেন তারে তৃণ সম দহে।"

এই অমর উপদেশটী বোধ হয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাই ফলে স্বামীর সহিত স্ত্রীর এবং স্ত্রীর সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। এই বিবাহ বিচ্ছেদ আইনানুমোদিতই হইয়াছে তবে জনসাধারণ তাহা অবগত নহে। মীরা শান্তিনিকেতনের কলা ও সঙ্গীত-ভবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন আর নগেন্দ্রনাথ নব-সঙ্গিনীর সন্ধানে, নবহৃদয়-জয়ের জয়যাত্রায় বাহির হইলেন।

এই ব্যাপারে মীরার চরিত্রের যে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়,

তাহার সহিত রাজস্থানের অতীত-যুগের মীরাবাঈরই শুধু তুলনা করা চলে। রাজস্থানের মীরাবাঈ স্বামী কুম্ভসিংহের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নাথজী শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন। এ যুগের মীরা গাঙ্গুলী—বর্ত্তমানে মীরা ঠাকুরও পতিবিচ্ছেদের পরে দ্বিতীয় পতিগ্রহণের বাঞ্ছা করিলেন না, শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও সঙ্গীত-ভবনের কর্ম্মতৎপরতা তাঁহাকে স্বার্থকতার পথ-প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবন-যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি শান্তি-নিকেতন তাঁহাকে শান্তি দিয়াছে, জীবনের অত্যাবশ্যকীয় যে বৈচিত্র্য তাহাও ঐ শান্তিনিকেতনেই তিনি পাইয়াছেন। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীরা তাঁহাকে দেবী তুল্য জ্ঞানে সম্মান ও ভক্তি করে। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত শান্তি-নিকেতনের কল-কোলাহলেই তিনি নিমজ্জিত থাকেন। রাত্রি সাড়ে নয়টায় যখন আশ্রমের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি নির্ব্বাপিত হয়, তখন দক্ষিণায়নের দ্বিতল-গবাক্ষে বসিয়া বর্ষণক্ষান্ত বাহিরের দিকে চাহিয়া পিতৃ-রচিত কাব্য-নির্ঝরে অবগাহন করিতে করিতে মীরা হয়তো আবৃত্তি করেন—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে
ময়ূরের মতো নাচে রে॥"

(কোরাস্)

পরিণামে যাহা ঘটিল, তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে। সুদীর্ঘ-কাল পতি-সহবাসে অভ্যস্থা মিসেস্ মায়া বানার্জ্জির পক্ষে পতি-বিরহিনী একাকিনী জীবন-যাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

শ্রীযুত নগেন্দ্র গাঙ্গুলীর পক্ষেও অধিককাল গৃহশূন্য হইয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। মায়া স্বামীর এবং নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সেকালের মদ্ররাজ-দুহিতা সাবিত্রীর পতি-অনুসন্ধানে যাত্রার সহিত একালের ব্যারিষ্টার-ভার্য্যার নব-পতি-সন্ধানে যাত্রার সকল বিষয়েই সৌসাদৃশ্য ছিল, কেবল একটী বিষয়ে ছিল না।

যাত্রাপথে রাজদুহিতার বাহন ছিল শকট আর ব্যারিষ্টার-ভার্য্যার বাহন হইল মোটরগাড়ী—একটী অশ্ব-চালিত, অপরটী পেট্রল্-সঞ্চালিত, এই অশ্ব আর পেট্রলের পার্থক্যবশতঃ যাত্রার নামকরণও বিভিন্ন হইয়া থাকিবে—সাবিত্রী বাহির হইয়াছিলেন অভিযানে, মায়া হয়তো বাহির হইলেন অভিসারে।

পথিমধ্যে দু'জনের হয়তো সাক্ষাৎকার হইল। সে সাক্ষাৎকার শিলঙ-পাহাড়ে মোটর-সঙ্ঘর্ষদ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল কিনা জানিনা—নগেন্দ্রের পরিধানে তখন "হাইলাণ্ডারী মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুৎ চামড়ার জুতো, খাকি নার্ফোক্ কোর্ত্তা, হাঁটু পর্য্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি এবং পকেটে গোটা পাঁচ সাত পাৎলা এডিশনের নানাভাষার কাব্যের বই" এবং মায়ারও "পরণে সরু পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের সাড়ি, সেই আলোয়ানের জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো, প্রশস্ত ললাট আবরিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, জ্যাকেটের হাত কবজি পর্য্যন্ত, দু'হাতে দু'টী সরু প্লেন বালা,

ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় ওঠা, কট্‌কি-কাজকরা রূপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ ছিল কিনা সে খবর লইবার অবকাশ পাই নাই—মিলন-মুহূর্ত্তে নগেন্দ্রনাথ "ও-পারে ঐ নূতন চাঁদ আর এ-পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটী অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না" বলিয়া মায়াকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন কিনা তাহাও শুনিতে পাই নাই। তবে লগ্নটী যে শুভলগ্ন ছিল, ক্ষণটী যে মহেন্দ্রক্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মিলন গাঢ় হইয়া আসিলে মায়া নগেন্দ্রের নিকটে বিবাহ-প্রস্তাব করিলেন, নগেন্দ্র সানন্দে অনুমোদন জানাইলেন। এক শুভলগ্নে দু'জনের বিবাহ হইয়া গেল। পতি-বিরহিনী নব-পতি-গ্রহণে এবং পত্নীবিরহী নব-পত্নী গ্রহণে শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিলেন।

সত্য-মিথ্যা সঠিক বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি এই বিবাহে মীরার এক বান্ধবী মীরার হ'য়ে ঋষিকবি রচিত একখানি "শেষের কবিতা" নগেন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন আর তাহাতে নীল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল এই কয়েকটী ছত্র—

"ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হ'তে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়।

রথের চঞ্চলবেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরাণো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হ'তে যদি দেখ চাহি'
পারিবেনা চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

* * * *

"কোনোদিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হ'তে যে রাত্রি বহিবে দীর্ঘশ্বাস
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো সে ফিরে দেবে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম হারা স্বপ্নের মূরতি।

* * * *

তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাকো, তাহারি আরতি
হোক্ তব সন্ধ্যাবেলা।
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে।

* * * *

"মোর লাগি করিয়োনা শোক,
আমার রয়েছে কর্ম্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।"

লীলাকমল দেবী + চন্দ্রকান্ত সান্যাল

ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী কবিতাকে ঈষদ্ পরিবর্ত্তিত করিয়া কোন কবি এই অভিনব রূপ দিয়াছেন :—

"কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীতে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেণিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছিলে মোর মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে মধুর আবেশ ভরে।

তব শেলের চশমাখানি
আমি খুলে রেখেছিনু টানি'
তুমি রেখেছিলে মোর বক্ষে তোমার শতেকের ছোঁয়া পাণি,
ছিল ফ্লার্ট-মুখরিত অধর নীরব, ককোয়েট্রির বাণী।
তব বিনানো বেণীর পাশ
মোর গলায় পড়াল ফাঁস
তব উন্নত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি
কভু ছিন্ন হবে না সে মিলন-ডোর ক'য়েছিলে তুমি মুখে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে ক্ষণিক মিলন সুখে।

আজি নির্ম্মলবায় শান্তউষায় গড়ের মাঠে একীরে
হেরি মোটরবাহিনী কে ঐ রমণী চলিতেছে ধীরে ধীরে।
সে-যে নবীন সাজেতে সাজি
লয়ে নূতন সঙ্গী আজি,
আর মাঝে মাঝে তার মোটরের হর্ণ বিকট উঠিছে বাজি।
এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায় গড়ের মাঠেতে আজি।
মোরে দেখি তার আঁখি দু'টী
ওঠে বিদ্রুপ-রেখা ফুটি'
ছিল নিশীথে যে মোর আপনার, দেছে নিশি-অবসানে ছুটি।

একী বিচিত্রময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!
রাতে ছলনার রূপ ধরি
ছিলে আমারই প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে বসিয়া অপর পাশে
মোরে বিঁধিলেক' পরিহাসে,
বুঝি স্বাধীন প্রেমের এমনি মহিমা, এমনি ফিরে দাঁড়ায়!
আর ফ্রী লভ্ কভু নহে এ জীবনে, নমস্কার করি তায়॥"

জানিনা এ কবিতা কবি খেয়ালের বশে লিখিয়াছিলেন কি কোন অভিজ্ঞতা-জনিত মর্ম্মবেদনা কবির লেখনী-মুখে এই কবিতা-উৎস উৎসরিত করিয়া দিয়াছিল। আমরা কিন্তু এক ভদ্রলোকের কথা জানি ফ্রী লভ্ বা বেপরোয়া প্রেমের নেশায় মশ্গুল হইয়া এক আধুনিকা তরুণীর "শতেকের ছোঁয়া পাণি" গ্রহণ করিতে যাইয়া যাঁহাকে এমনি মর্ম্মবেদনা পাইতে হইয়াছিল। ইনিই আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক।

এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত সান্যাল। রাজসাহীতে আদিম নিবাস হইলেও ইঁহারা তিন পুরুষ আসাম প্রদেশে বাস করেন। আসামে ইঁহাদের কিছু জমিদারী আছে, অবস্থা ভাল। আমোদ-প্রমোদের সুবিধা আছে বলিয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া প্রায়শঃ কোন সাহেবী হোটেলে বাস করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালেই তিনি ব্যারীষ্টার-কন্যা লীলাকমলের প্রেমে পড়েন।

লীলার পিতা ব্যারীষ্টারীতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের বলে নিজ পরিবারে তিনি পূরা সাহেবিয়ানা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ বলিতে বারো আনা সাহেব চারি আনা বাঙ্গালীর যে জগা-খিঁচুরী সমাজকে বুঝায় তিনি ছিলেন সেই সমাজের লোক। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকেই তিনি সাহেবিয়ানায় পুরাদস্তুর অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। সাহেবিয়ানা কেবল তাঁহার সখ ছিল না, নেশায় পরিণত হইয়াছিল। নেশার ঝোঁকে তিনি মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার পুত্রটী হইয়া দাঁড়াইল একটী গণ্ডমুর্খ এবং কন্যাটী উড়ন্ত প্রজাপতি। তাহাদের কাহাকেও মানুষ করিতে না পারিয়া শেষ জীবনে সাহেবকে যথেষ্ট মনস্তাপ ভুগিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এই মনস্তাপ আসিয়াছিল অতি বিলম্বে—তখন আর শোধ-রাইবার উপায় ছিল না। পুত্রটী লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল এবং কন্যা পেখম তুলিয়া নৃত্য সুরু করিয়াছিল।

এজন্য পুত্র-কন্যাদের দায়ী করা যায় না, দায়ী ব্যারীষ্টার সাহেব নিজেই। তিনিই পুত্রকে স্বীয় বন্ধুগণের পরিবার মধ্যে পরিচয়লাভ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন এবং একপাল অনুগ্রহীত যুবককে স্বীয় পরিবার মধ্যে অবাধ-গতির অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এই 'গতি' অনুগৃহীতগণের নিকটে 'সদ্গতি' বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ব্যারীষ্টার

সাহেবের নিজের পক্ষে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল 'দুর্গতি' বিশেষ। দুঃখের বিষয় তিনি উহা আগে বুঝেন নাই; তরুণী কন্যা স্বাধীনভাবে মেলামিশা করিয়া তাহাদেরই একজনকে পতিরূপে নির্ব্বাচিত করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার বাসনা। গৃহিণীর সহিত যথেষ্ট বনিবনাও থাকিলেও তিনি নিজে যে কোর্ট-সিপ করিয়া বিবাহ করেন নাই, এজন্য বরাবরই তাঁহার মনে একটা ক্ষোভ ছিল; ঐ কারণে পুত্র-কন্যাদের বিবাহ যাহাতে কোর্টসিপ্ করিয়াই হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ব্যারীষ্টার-গৃহিণীও পাকা সাহেবের মেয়ে, তাই স্বামীর এই সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিই তাঁহার ছিল।

এক ভোজ সভায় চন্দ্রকান্তের সহিত ব্যারিষ্টার সাহেবের পরিচয় হয়। সুদর্শন যুবকটীকে প্রথম দর্শনেই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল; পরে যখন শুনিলেন সে জমীদার ও অর্থবান, তখন তিনি নাছোড়-বান্দা হইয়া তাহার পিছু লইলেন। ভোজ-সভা হইতে সেইদিনই চন্দ্রকান্তের হোটেলে গেলেন, মহার্ঘ সাহেবী-হোটেলের সুমার্জ্জিত কক্ষে চন্দ্রকান্তের বহুমূল্য জিনিষপত্র দেখিয়া বুঝিলেন—চন্দ্রকান্ত সত্যসত্যই বড়লোকের সন্তান। পরবর্ত্তী শনিবারে আপনার বাড়ীতে তাহাকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

যথাসময়ে মোটরের ভেঁপুতে সকলকে সচকিত করিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যারীষ্টার ও ব্যারীষ্টার-গৃহিণী করমর্দ্দনের জন্য বাহু প্রসারিত করিলে তিনি করমর্দ্দন করিলেন। তবে লীলা যখন তাহার সুগোল সুডৌল বাহুটী মন্দমলয়-বিতাড়িত নীলকমলটীর ন্যায় ঈষদ্ অগ্রসর করিয়া দিল, সে সুযোগ গ্রহণে চন্দ্রকান্ত ত্রুটী করিলেন না—ঈষদ্ হাসিয়া নিজের হাতের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া লীলাকমলের করকমল নিপীড়িত করিলেন।

মোটের উপরে একথা সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে সেইদিনই চন্দ্রকান্ত এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে আবদ্ধ হইলেন এবং সে বন্ধনের ফলে এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে লীলার সহিত চন্দ্রকান্তের শুভ-পরিণয় সঙ্ঘটিত হইল।

চন্দ্রকান্তের এই বিবাহে তাঁহার পিতার মত ছিল না; বিবাহের কোন অংশই তিনি গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন পুত্র নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়াছে এবং কালীঘাটের বর্দ্ধিত অঞ্চলে বাড়ী তৈয়েরীর জন্য ম্যানেজারের নিকটে টাকা চাহিয়া লিখিয়াছে, তখন তিনি আর দূরে সরিয়া থাকা সমুচিত বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণীর মারফৎ পুত্রের নিকটে এই মর্শ্মে এক চিঠি পাঠাইলেন যে, সে যেন অবিলম্বে বধূকে লইয়া চলিয়া আসে; কলিকাতায় বাড়ী-নির্ম্মাণ পরে করিলেও চলিবে।

চন্দ্রকান্ত দেখিলেন, মায়ের এই আহ্বান উপেক্ষা না করিয়া লীলাকে লইয়া আসাম চলিয়া যাওয়াই সঙ্গত হইবে। লীলার পিতা একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, লীলারও যে আসাম যাইতে আগ্রহ ছিল তাহা নহে। কিন্তু লীলার মাতা কন্যাকে বুঝাইলেন যে, একমাত্র স্বামীদ্বারা বিবাহিত জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ হয় না—শাশুড়ী জীবিতা ছিলেন না বলিয়া তাঁহার নিজেরই কত আপশোষ ছিল! স্বামী বুঝাইলেন যে, জামাতা যদি পিতামাতার অবাধ্য হয়, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া দিতেও তো পারেন। অবশেষে লীলা স্বামীর ঘর করিতে আসাম যাইবে বলিয়াই সাব্যস্ত হইল।

স্বামীর সঙ্গে লীলাকমল আসাম চলিয়া গেল। কিন্তু স্বামী-গৃহের একদিনের অভিজ্ঞতায়ই তাঁহার মন বাঁকিয়া বসিল—সেখানে না আছে একটা 'টেনিস্ লন্', না আছে পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবীর সহিত আড্ডা

জমাইবার সুযোগ! শতদলে শত-ভ্রমরকে মধুপানে পরিতৃপ্ত করা যাহার অভ্যাস, সেই লীলাকমল কি পারে একটা সূর্য্যের পানে চাহিয়া রহিতে! উস্‌খুস্ করিয়া—স্বামীর নিকটে সহস্র অভিযোগ জানাইয়া মান-অভিমানের অবিশ্রান্ত পালাগানে চন্দ্রকান্তের ন্যায় সাহেব স্বামীকেও সে নাস্তনাবুদ করিয়া তুলিল। অগত্যা চন্দ্রকান্ত পিতার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি কাঠের ব্যবসা করিবেন এবং শিলিগুড়িতে স্ত্রী সহ বাস করিবেন। বধুর চরিত্র বুঝিয়া লইতে চন্দ্রকান্তের পিতা-মাতার বাকী ছিল না—তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার অসহনীয় সঙ্গ পরিহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই পুত্রকে সচ্ছন্দ-মনেই পত্নীসহ ইচ্ছামত স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। লীলাকে লইয়া চন্দ্রকান্ত শিলিগুড়িতে গিয়া কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং দারজিলিং বাস করিতে লাগিলেন।

লীলা দেখিল, তাহারা পূর্ব্বে যেখানে ছিল, দারজিলিং এবং শিলিগুড়ি তাহা অপেক্ষা অনেকটা ভাল সহর; তাহা ছাড়া মেলামিশা করিবার মত লোক এখানে আছে। কটন কলেজের কোন অধ্যাপকের কন্যা কলিকাতায় থাকিয়া যখন লেখা-পড়া করিত, তখন তাহার সহিত লীলার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। লীলার সেই বান্ধবীটী বিবাহ করিয়া শ্বশুর-ঘর করিতে গেলেও তাহার মায়ের সহিত লীলা আলাপ জমাইল। ইহা ছাড়া পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর (এখন অবসর প্রাপ্ত) বাবু হরচন্দ্র সরকার লীলার পিতৃবন্ধু। প্রবাসে বন্ধু-কন্যার সন্ধান পাইয়া তিনি কন্যাবৎ স্নেহে তাহার খবর লইতে লাগিলেন। এইভাবে লীলা নিজেই অনেকের সহিত আলাপ জমাইয়া তুলিল। ব্যবসায় হিসাবে যাঁহারা চন্দ্রকান্তের নিকটে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেও যে লীলা দুই একটী বন্ধু জুটাইয়া না লইল এরূপ নহে।

ইহা ছাড়া স্বামীর কর্ম্মচারিগণের সহিত লীলা ঘনিষ্টভাবে মেলা-মিশা আরম্ভ করিল—অন্তঃপুর মধ্যে তাহাদিগকে অবাধ গতিবিধির অধিকার দিল। লীলার এরূপ ব্যবহারে কর্ম্মচারীরা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক রূপে প্রশ্রয় পাইয়া যাইতে পারে—চন্দ্রকান্ত পুনঃপুনঃ লীলাকে একথা জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। লীলার সেই একই উত্তর—"একেই এই জংলীদেশে নির্ব্বাসিত হইয়া আছি, তার উপর তুমি কি আমাকে নির্জ্জন কারাবাসে বন্দী করিয়া রাখিতে চাও ?" চন্দ্রকান্ত আর কি বলিবেন, যে খাদ তিনি নিজের হাতে খনন করিয়াছেন, তাহার প্লাবন নীরবে সহিয়া যাওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে !

একমাত্র স্বামীসঙ্গে অতৃপ্ত—অপর পুরুষ-সঙ্গীর অভাবে অতিষ্ঠ লীলা অবশেষে স্বামীরই এক কর্ম্মচারীকে অনুগৃহীত করিল। টের পাইয়া চন্দ্রকান্ত যখন সেই কর্ম্মচারীটীকে কার্য্যে অমনোযোগিতার ছুতা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, লীলা তখন মরীয়া হইয়া একে একে স্বামীর অন্য দুইটী কর্ম্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলেন। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া চন্দ্রকান্ত এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা নীরবে সহিয়া যাইতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। লীলা এখন অনেকগুলি পুত্রকন্যার জননী—তাহার পুত্রকন্যাগণেরও অনেকেরই বিবাহের বয়স হইয়াছে কিন্তু লীলা তাহার অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বেপরোয়া হইয়াছে। তাহার এই বেপরোয়া স্বভাব স্বামীপুত্রের নিকটে অসহ্য বোধ হয়, তবু তাহারা চুপ করিয়া থাকে। স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক চন্দ্রকান্ত বহুদিন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। পুত্রেরা উদ্দাসীর ন্যায় বিদেশে ঘুরিতেছে, বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিতে চাহে না। বাড়ীতে

অহরহ যে অপ্রীতিকর ঘটনা চলিতেছে, একটী পবিত্রহৃদয়া বালিকাকে তাহার মধ্যে আনিয়া রাখিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই।

চন্দ্রকান্তের এই শোচনীয় পরিণামের জন্য কাহাকে দায়ী করা হইবে, এ প্রশ্ন যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা নিশ্চয় বলিব—দায়ী ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রেমমূলক বিবাহ-প্রথা। নর ও নারী —তরুণ ও তরুণী পরস্পর পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবে, আজীবনের সঙ্গী-সঙ্গিনীর অন্তরের গূঢ়রহস্যের সন্ধান মিলনের পূর্ব্বেই অবগত হইয়া লইবে, বাহির হইতে ইহা খুবই সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একজন অপরিচিতের সহিত স্বেচ্ছায় হৃদয়-বিনিময় করিতে পারিয়াছে, সে যে পূর্ব্ব হইতেই প্রেমের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞা হইয়া উঠে নাই ইহা কে বলিতে পারে? সকল জিনিষেরই নেশা আছে, সকল অভ্যাসেরই প্রকৃতিগত আকর্ষণ আছে। যে নারী পর পুরুষসঙ্গের বা যে পুরুষ পর-নারীসঙ্গের মোহনীয়তা একবার উপলব্ধি করিয়াছে, সে কি তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? বিবাহের পূর্ব্বে নর নারীর পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা অজানার প্রতি আকর্ষণ। বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমের যে সম্মোহ তাহাদের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অজানিত অভ্যাগতকে হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদানের সম্মোহ। বিবাহের পরেও যে তাহাদের হৃদয় অজানিত হৃদয়ের গূঢ়রহস্য জানিবার জন্য উদ্বেলিতা হইয়া উঠিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি?

যমুনা দাসী + সতীশ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করেন, দেশে তাঁহার কিছু বিত্তসম্পত্তি আছে। এককালে চট্টোপাধ্যায় বংশের বড় জমীদার বলিয়া খ্যাতি ছিল; বর্ত্তমানে জমীদারী কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও জমীদার বংশের খ্যাতিটুকু আছে। এখনও সতীশবাবুর গ্রামে যে বালিকা বিদ্যালয়টী আছে সতীশবাবুই তাহার সেক্রেটারী।

সতীশবাবুর দুই সংসার। প্রথমপক্ষেয় স্ত্রী দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করায় তিনি দ্বিতীয় সংসার গ্রহণ করেন। এপক্ষেও তাঁহার একটী ছেলে; প্রথমপক্ষের স্ত্রী তাঁহার সুন্দরী ছিল না। সেই দুঃখ মিটাইবার জন্য তিনি দেখিয়া শুনিয়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। সুবর্ণলতা দেখিতে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। পতি-গৃহে আসিয়াই তিনি স্বামীর প্রথমপক্ষের সন্তানগণকে এরূপ আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, বাহির হইতে কাহারও বুঝিবার জো ছিল না যে, তিনি তাহাদের গর্ভধারিণী মা নহেন। সকলেই বলাবলি করিত— দোজ-বরে বৌ তো এনন ভাল হয় না।

সুবর্ণলতার রূপ আর গুণ দু'টীতেই সতীশবাবু মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই সুখী দম্পতীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল আর একজন—সূর্য্যগ্রহণ কালে পৃথিবী আর সূর্য্যের মাঝখানে আসিয়া চন্দ্র যেমন দাঁড়ায়, তেমনি।

এই চন্দ্রিকাটী হইতেছেন মিসেস্ দাস ওরফে শ্রীমতী যমুনা দাসী—

শিক্ষিতা মিশনারী মহিলা, বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ বা পরিদর্শিকা। সতীশবাবুর গ্রামস্থ বালিকা বিদ্যালয়টী ইনি উপর্যুপরি কয়েকবার পরিদর্শন করিতে আসেন, সেই সূত্রেই সতীশবাবুর সহিত ইঁহার পরিচয় ঘটে।

পাঠক-পাঠিকা যদি আশা করিয়া থাকেন, আমরা এই মিসেস্‌ দাস ওরফে শ্রীমতী যমুনা দাসীর বংশ-তালিকা আপনাদের সম্মুখে দাখিল করিব, তাহা হইলে আপনাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। সে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা আমরা করিব না—এমন কি যমুনার মাতৃ-পরিচয় পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া কাহারও সুনামের হানি করিব না। কেবল মিসেস্‌ দাস ওরফে শ্রীমতী যমুনা দাসীর বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনীর কিছু কিছু অপনাদিগকে উপহার দিব।

মফঃস্বলের কোন জিলা সহরের সরকারী প্রসবাগারে যমুনাকে প্রসব করিয়া তাঁহার মাতা পলাইয়া গেলে একজন ধাত্রী দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান এবং যথাসময়ে মিশনারী সাহেবদের হাতে সমর্পণ করেন। মিশনারীরাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া "মানুষ" করিয়া তোলেন।

বি. এ. পাশ করিয়া যমুনা যখন একটী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছিল, তখন ঐ স্কুলেরই কোন পুরুষ সহকারী শিক্ষক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। শূন্যগৃহে একক জীবন যাপন যমুনার ভাল লাগিতেছিল না; তাই তিনি সহকারী শিক্ষকের সহযোগ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শিক্ষকটীকে পিতা মাতার ত্যাজ্য পুত্র হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইল।

কিন্তু এ বন্ধন টিকিল না। একবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া যমুনা ডাক্তার দাস নামক এক মফঃস্বলের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন কর্ত্তৃক

চিকিৎসিত হইতেছিলেন। প্রায় ছয়মাস চিকিৎসার পরে যমুনা আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে নূতন রোগে পাইয়া বসিল। এবারে আর জরায়ুর ব্যাধি নয়, এবারকার ব্যাধি স্নায়ুর এবং একবারেই এ ব্যাধির দশম দশায় উপনীত হইয়া যমুনা ডাক্তারের নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। শিক্ষক বেচারী রেহাই পাইয়া শুদ্ধি করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অত্যুদার আশ্রয়ে পুনঃ প্রবেশ করিল—পিতৃগৃহে স্থান না পাইলেও পিতৃসম্পত্তির সে অধিকারী হইল।

ডাক্তারের সহিত যমুনা দীর্ঘ কাল ঘর করিয়াছেন; ডাক্তার যদি তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ভবসাগরে পাড়ি না মারিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই অবস্থায় যমুনা জীবনটাও কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তিনি বিধবা হইলেন।

শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইলেও সেই শিক্ষক—যমুনার প্রথম স্বামী—তখনও বিবাহ করেন নাই। হিন্দু সমাজে তাঁহার জন্য পাত্রী মিলিতেছিল না বলিয়াই হয়তো তিনি চিরকৌমার্য্যাবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন। যমুনা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তিনি পুনরায় "কেঁচে গণ্ডুস্" করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অগত্যা যমুনা একক জীবনই যাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আমাদের সতীশবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং প্রথমালাপেই প্রেম-সঞ্চার। যমুনা এক বৎসরের ছুটি লইয়া সতীশবাবুর সহিত রাঁচিতে চলিয়া গেলেন। যাত্রার পূর্ব্বে সিভিল ম্যারেজ্ এ্যাক্ট অনুসারে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহের সময়ে সতীশবাবুর বয়স ৪৪।৪৫ এবং যমুনার বয়স ৩৫।৩৬ হইবে।

সতীশ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স্ কিন্তু তখন সতেরো আঠারোর বেশী হইবে না। শুনিতে পাই—দাম্পত্য অথবা প্রেম-ঘটিত

ব্যাপারে বয়সের অল্পতা ও অনভিজ্ঞতা বয়সের আধিক্য ও অভিজ্ঞতা হইতে অধিক কার্য্যকরী। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহা মনে হয় না—স্বুবর্ণলতার তিনগুণ বয়সী যমুনার যৌবন-তরী উজান ঠেলিয়া চলিলেও স্বুবর্ণলতা অপেক্ষা অন্ততঃ তিনগুণ শক্তিমতী বলিয়া মনে হইতেছে। স্বুবর্ণলতা স্বামীর প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগুলি লইয়া পিতৃ-গৃহে বাস করেন।

দ্বিতীয় পক্ষে যমুনার একটী কন্যা সন্তান ছিল। তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সেটীকে তিনি এক মিশনারীর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। মেয়ের নাম নাকি বিরহিনী। বিরহিনীর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখিনা, তবে শুনিয়াছি যে আজকাল মফঃস্বলের কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। মাতার স্বুনাম তাঁহাদ্বারা রক্ষিত হইবে বলিয়া নাকি আশা করা যায়।

যমুনার সহিত সতীশবাবুর ঈদানীং খিটিমিটী চলিতেছে; ঝগড়া প্রায় লাগিয়াই আছে—ফারকৎ ঘটিয়া যাওয়াও নাকি অসম্ভব নহে। লভ-ম্যারেজ বা সখ্য বিবাহের যে এরূপ পরিণামই ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সাধনা রায় + মধু বোস

মিসেস্ রায়ের নাম এলগিন রোড অঞ্চলে সুপরিচিত। কি বংশ-মর্য্যাদায়, কি আধিপত্য-গৌরবে, কি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, কি পরোপকার প্রবণতায়—সকল দিক্ দিয়াই তিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয়া।

শ্রীমতী সাধনা তাঁহারই কন্যা, তন্বী না হইলেও সুন্দরী—কবিরা "পল্লবিনী লতৈব" বলিয়া যে শ্রেণীর সুন্দরীগণের বর্ণনা করিয়াছেন সেই শ্রেণীর সুন্দরী। চোখ-মুখে বেশ একটু দীপ্তি রহিয়াছে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—একশো মেয়ের বিরাট মজলিসের মধ্য হইতেও সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

অর্থের অপ্রতুল নাই। মিসেস্ রায় কন্যাকে শিক্ষা-দীক্ষায় আপনারই অনুরূপ করিয়া তুলিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধনাও বুদ্ধি এবং প্রতিভাবলে তাঁহার সে চেষ্টা স্বার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ডায়সিসান কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ করিয়া ঐ কলেজেই সে আই এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। বিবাহের বাতাস গায়ে না লাগিলে সাধনা যে কৃতিত্বের সহিত আই এ, বি এ এবং এম্ এ পাশ করিত, পরিচিত মহলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

মিসেস্ রায় মেট্রণ রাখিয়া মেয়েকে আদব-কায়দা, সভ্যতা-ভব্যতা শিখাইয়াছেন; সমাজে তাই তাহার অপরিসীম প্রতিষ্ঠা। কাহার সহিত কতটুকু কথা বলিতে বা না বলিতে হইবে; কাহাকে এড়াইয়া চলিতে এবং কাহাকে খুসী করিতে হইবে; কাহাকে করমর্দ্দন দ্বারা

আর কাহাকে শুধু নমস্কার দ্বারা আপ্যায়িত করিতে হইবে; বান্ধব-বান্ধবী মহলে চলা-ফিরার কতটুকু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে; কোন টেবিলে কিরূপ কথায় কতটুকু হাসিতে হইবে এবং সে হাসি কখন শুধু চোখের উজ্জ্বলতায়, কখন অধরের ঈষদ্ বঙ্কিমতায় রূপায়িত হইবে, কখন বা দন্ত-বিকাশের উচ্ছলতা সৌজন্যের গণ্ডী অতিক্রম করিবে না—সাধনার তাহা খুবই জানা আছে এবং এই কারণেও সাধনা পরিচিত মহলের প্রিয়, অপরিচিতগণের বিস্ময়।

কণ্ঠস্বরটীও সাধনার সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—"উৎস-জলের যে-উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটীর কণ্ঠস্বর তারি মতো নিটোল! অল্প বয়সের বালকের গলার মত মসৃণ এবং প্রশান্ত।" মিষ্টার মধু বোস্ এ কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত শুনিতে পাইতেন। হঠাৎ একবার শুনিলে হয়তো ভাবিতেন, এর গলার সুরে যে-একটী স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে! তিনি যদি শেষের কবিতার "অমিট্ রায়ে" হইতেন তাহা হইলে হয়তো নোটবই-খানা খুলিয়া লিখিতেন, "এ যেন অম্বুরী তামাকের হাল্‌কা ধোঁয়া জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসচে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ।"

সাধনার কণ্ঠস্বরে মিষ্টতাই শুধু নাই, আছে তার সাথে সাথে সাধনাও। ছেলে-বেলাতেই সাধনার কণ্ঠে গান ফুটিয়াছিল—উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষকতায় সেই গানের গলা গীতি-কণ্ঠে পরিণত হইয়াছে। সাধনা বেশ গায়, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বলা হইবে না—বনের বুল্‌বুল্ পাপিয়াও তো ভাল গায়, তাহাদের কণ্ঠস্বরে মাদকতা আছে। সাধনার গীতি-দক্ষতার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে, সঙ্গীতে সাধনার

দখল আছে। রবিঠাকুরের আধুনিকতম গানগুলি তার আয়ত্ত, নজরুল তার কণ্ঠস্থ, কিছু কিছু ইংরাজী এবং দু'চারটী ফরাসী গানও তার অধরস্থ। পিয়ানোর কাছে বসিয়া টুং টুং করিতে করিতে মিস্ রায় যখন গায়—

"When the sun will shine again the valley,
Daisy will lough to blossom the lily ;
We will meet again in coral hoes,
In Joyous mood and Pearl shoes,
Then ding-dong, ding-dong will ring the sally."

তখন তার "ding-dong—ding-dong" শব্দের কম্পিত তরঙ্গগুলি সমাগত যুবকগণের মনকে তো তরঙ্গায়িত করিয়া তোলেই, তার ইংরাজ বান্ধবীগণও সে গীতি-লহরের প্রশংসা না করিয়া পারেন না।

গানের পরেই নাচ। এই জিনিষটায়ও সাধনা দখল করিয়া লইল। অবশ্য তার এই নৃত্য-দক্ষতার জন্য আমরা তাহাকে যতটা "কম্প্লিমেণ্ট" দিব, তার বেশীর ভাগই সে হস্তান্তর করিয়া দিবে তার ভূতপূর্ব্ব cousin brother বা মামত ভাইকে (ইয়েতে ইয়েতে নহে)—বর্ত্তমানে স্বামী মিষ্টার বোসের কথাই আপাততঃ কিছু বলিয়া লই :—

মিষ্টার বোস্ ওরফে মধু বোস্ সাধনার মা মিসেস্ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনিও সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত এবং সুমার্জ্জিত। সুমার্জ্জিত বলিলাম বলিয়া পাঠক ভুল বুঝিবেন না, হেজিলিন্ এবং পাউডার দ্বারা অঙ্গমার্জ্জনা করেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে সুমার্জ্জিত বিশেষণে বিশেষিত করিতেছি না। যে মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন সমাজে মিসেস্ রায়ের অবস্থিতি, সেই সমাজের হাল-চাল, ফ্যাশান এবং ষ্টাইলগুলিতে অনিন্দ্যনীয় দখল

আছে বলিয়াই মিঃ বোস্‌কে আমরা সুমার্জ্জিত বলিতেছি। মিঃ বোসের হয়তো স্মরণ নাই, তখনও তিনি সাধনায় সিদ্ধ হ'ন নাই—একাধিক মজ্‌লিসে আমরা তাঁহার সহিত একত্র হইয়াছি; তাঁহার আদব-কায়দায় এবং আন্তরিকতায় আমার সমভাবেই মুগ্ধ হইয়াছি। তখন পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম না হইলেও একদিন যে তিনি উন্নতি করিবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা তখনই করিয়াছিলাম।

মিঃ বোস্ রায়-পরিবারেই অবস্থান করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা এরূপ অসচ্ছল ছিল না যে "কাঁতিনাতাঁল" কিংবা অপর কোন সাহেবী হোটেলে তিনি বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু পিসিমাকে দেখিবার জন্য বিশেষতঃ পিস্‌তুত বোন সাধনার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহার ন্যায় একজন cultured ও চরিত্রবান লোকের প্রয়োজন ছিল এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে অগ্রণী হইবার মত উদারতা ও সৌভ্রাত্র্যজ্ঞান (Philanthrophy শব্দের আর কি ছাই বঙ্গানুবাদ করিব ?) তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

মিঃ বোস্ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার যেরূপ ধীশক্তি ও অনুশীলন প্রবৃত্তি, তাহাতে সেই উচ্চ শিক্ষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাগুলি অতিক্রম করিয়া অত্যুচ্চশিক্ষায় পরিণত হইতে পারিত না, এমন অসত্য উক্তি আমরা করিতে চাহি না। কিন্তু কোন বিশেষ বিদ্যামন্দিরের প্রবেশ-দ্বার যাঁহার অতিক্রমণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সাধ্য কি তাহার সেই মন্দিরস্থ দেবতার আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া ডিগ্রী-দেবতার রুদ্ধদ্বারে গিয়া করাঘাত করে। সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার "সেকেণ্ডারী এডুকেশন" অতিক্রমণ করিয়া, গীত-চর্চ্চার ডিগ্রী ও নৃত্য-চর্চ্চার ডিপ্লোমা লাভ করিয়া মিঃ বোস্ ছায়াছিত্র-প্রযোজনার ডক্টরসিপের জন্য প্রস্তুত

হইলেন। রায়-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ এবং প্রেম-দেবতার আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ্ লাভে পূর্ব্বেই সমর্থ করিয়াছিল।

একই পরিবারে পালিত হইয়া, একই সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া সাধনা ও মিঃ বোস্ একই শিক্ষায় শিক্ষিত, একই দীক্ষায় দীক্ষিত, একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সর্ব্ববিষয়ক ও সর্ব্বাঙ্গীন যে ঐক্য, বিবাহের পূর্ব্বে এইরূপ একত্র বাসের ফলেই কেবল তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে নহে। এই কারণে মধু-সাধনার মিলনকে কেবল কাজিন্ বিবাহ বা 'তুতো' ভাই-বোনে বিবাহ বলা চলে, Experimental marriage বা পরীক্ষা-সিদ্ধ বিবাহ বলিয়া ইহাকে আখ্যাত করা চলে না। আমাদের এদেশে যে এরূপ পরীক্ষা-সিদ্ধ বিবাহের প্রচলন নাই, ইহা নিশ্চয়ই আর্য্যঋষিগণের অজ্ঞতার ফল। তাঁহারা কেবল গোত্র-প্রবরের পার্থক্য ঘটাইয়া হাতের ফলটীকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে বংশের ধারা-রক্ষা ও রক্তের সংমিশ্রণ-নিরোধ যত সতর্কতার সহিতই রক্ষিত হৌক এবং ভবিষ্য-গোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে যত নিশ্চয়তা দান করুক, তরুণ-তরুণীর সহজলভ্য সুখভোগে যে পর্য্যাপ্ত বাধা-প্রদান করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হতচ্ছাড়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে পুরুষগণ মধ্যে মিঃ বোস্ এবং রমণীকুল মধ্যে মিস্ সাধনা যে সেই পরম দুর্ভাগ্য ও চরম দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এজন্য সৃজনকর্ত্তা কিংবা বিশ্ব-নিয়ন্তাকে অশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ।

সাধনার গীতি-দক্ষতার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; মিঃ বোসের নৃত্য-পটুতা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। তাঁহার নৃত্য-পটুতা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এ্যামেচার বা সৌখীন নর্ত্তকীকুলের

মধ্যে সাগর-নৃত্য-বিশেষজ্ঞা শ্রীমতী রেবা রায়ের নৃত্য-কুশলতার পরিচয় আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের স্থল বিশেষে প্রসঙ্গক্রমে দিয়াছি। বিশ্বভারতীর শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত নন্দলাল বসুর কন্যা মিস্ গৌরী বসু—বর্ত্তমানে মিসেস্ গৌরী ভঞ্জচৌধুরী নটীর পূজার নটী-নৃত্যে যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে শ্রীমতী রেবা রায়ের পার্শ্বেই স্থান দিয়াছে।

সৌখীন নর্ত্তকীকুলের মধ্যে শ্রীমতী সাধনার স্থান তাঁহাদেরই পরে—মিস্ অমলা নন্দীও মিস্ ছবি পালিত সাধনার পরবর্ত্তিনী। কিন্তু সৌখীন নর্ত্তকগণের মধ্যে মিঃ মধু বোস্ যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এহেন দাদা মধু বোস্ যে বোনটী সাধনাকে আপনার নৃত্য-সাধনার সঙ্গিনী করিয়া লইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

দাদার শিক্ষায় বোনটী নৃত্য-নিপুনা হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ-বিহীন নৃত্য-নিপুণতা বোরখাবৃতা মোস্লেম জেনানার সৌন্দর্য্যের মতই ব্যর্থ। তাই মিঃ বোস সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাধনা বোনের নৃত্য-চাটুল্য প্রদর্শনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভাই বোনে ডুয়েল ড্যান্সিং বা দ্বৈত-নৃত্য চলিতে পারে কিন্তু উপযুক্ত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড ব্যতিরেকে সে দ্বৈত্যনৃত্য চলিতে পারে না। মিঃ বোস তাই একটী ভদ্র নরনারীর নৃত্য-সঙ্ঘ গঠন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পুত্র শ্রীযুত কুণাল সেন, পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এবং অন্যান্য বহু ভদ্র নরনারী নৃত্যাভিনয়ের কস্‌রৎ প্রদর্শন জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ বোস্ তাহাদিগকে দলস্থ করিয়া লইলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলিবাবা" নামক গীতি-নাট্যখানি অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত

হইল। রসিক চূড়ামণি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কোন নাট্য-রূপ বাজারে প্রচলিত ছিল না বলিয়াই বোধ করি সেখানি নির্ব্বাচিত হয় নাই।

এই অভিনয়ে মধু বোস্ আবদালার আর সাধনা মর্জ্জিনার ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। রঙ্গমঞ্চে আলিবাবার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, আবদালা ও মর্জ্জিনাকে হাত ধরাধরি করিয়া কিরূপ নাচিতে হয়—কিরূপ চাটুল্য ও কুৎসিৎ ইঙ্গিতপূর্ণ প্রেমাভিনয় করিতে হয়। মধু ও সাধনা এই প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকা দু'টী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পাঠক কল্পনা করিয়া বসিবেন না, এই অভিনয়ের পূর্ব্বেই তাঁহাদের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার গূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ বোনটী অপর কোন পুরুষের হাত ধরিয়া "বাদ্শা-বেগম ঝম্ঝমা-ঝম্" নাচিবে, হাসিতে ঠাট্টায় চোখের ইঙ্গিতে শারীরিক সান্নিধ্যে প্রেমাভিনয় করিবে, দাদা হইয়া মিঃ বোস তাহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাই বোনকে অপরের হাতে সঁপিয়া না দিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। বোনটীও অপর নৃত্য-নায়ক খুঁজিয়া লওয়া অপেক্ষা দাদাকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

মিথ্যা বলিবনা—এইরূপ অভিনব আত্ম-সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্য প্রশংসার সবটুকু ইঁহারাই পাইতে পারেন না। সর্ব্ববিষয়ে যুগ-প্রগতির অগ্রণী ঋষি রবীন্দ্রনাথকে এজন্য সর্ব্বাগ্রে বাহাদুরী দিতে হইবে। তপতী নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে রাণী সাজাইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া অসীম ঔদার্য্য প্রদর্শন করতঃ নিজেই সেই রাণীর রাজা সাজিয়া বসিয়াছিলেন, নহিলে যে অপরে তাঁহারই কুল-ললনার পাণি গ্রহণ করিয়া বসে। শ্বশুর হইয়া কি করিয়া তিনি সেই দুর্দ্দৈব পর্য্যবেক্ষণ করেন? তাই রাণী পুত্রবধূর রাজার আসনটী স্বয়ং

শ্বশুরই গ্রহণ করিলেন! রঙ্গমঞ্চের বাহিরে পুত্রবধূর অভিভাবক যে শ্বশুর, রঙ্গমঞ্চের ভিতরেই বা বধূর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সেই শ্বশুরই কেন গ্রহণ করিবেন না!

যাহা হৌক্ মিঃ বোস্ ও মিস্ রায় কেবল আলিবাবা নাটিকাতেই নায়ক-নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করেন নাই; অপর দু'চারিখানি নাটকেও তাঁহারা নায়িকা-প্রতিনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতঃ সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেন।

সম্ভবতঃ এইরূপ প্রেমাভিনয় করিতে করিতেই তাঁহাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রেম জন্মিয়া যায় এবং হয়তো এক শুভরাত্রে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়াই তাঁহারা অনুভব করেন যে, পরস্পরের সহিত আইন ও সমাজ-সঙ্গত সান্নিধ্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের জীবন সুখময় হইবে না। একই দিনে একই সময়ে তাঁহারা মিসেস্ রায়ের নিকটে আপনাদের বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। মিসেস্ রায় হয়তো ইহাতে বিস্মিত হইলেন না, কারণ মনে মনে তিনি এইরূপ কোন অনিবার্য্য-পরিণামেরই হয়তো প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি সম্মতি-প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে যথারীতিতে সাধনা-মধুর বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে কলিকাতার সাংবাদিককুল ও সাহিত্যিককুলের অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; যোগদানও বড় কম লোক করেন নাই। সংবাদপত্রের মারফৎ বিবাহের বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল, সকলেই সে কাহিনী পাঠ করিয়া থাকিবেন।

বিবাহের পরেও তাঁহারা একত্রে অভিনয় করিয়াছেন—কয়েকমাস পূর্ব্বেও তাঁহাদিগকে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" গল্পের নাট্যাভিনয় করিতে দেখা গিয়াছে। এই নাটকেও নায়ক-

নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন মিঃ মধু বোস্ ও মিসেস্ সাধনা বোস্। রঙ্গমঞ্চে প্রেমের যে অভিনয় তাঁহারা করিয়াছিলেন, বাস্তব জীবনে তাহাই সত্যে পরিণত হইল।

আমরা প্রণয়ী যুগলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করি। সঙ্গে সঙ্গে মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া লই ভদ্রনারী-নৃত্যের ও 'কাজিন্'-বিবাহের যে দুইটী মহদনুষ্ঠানের পরিণামে মধু-সাধনায় এই অবিস্মরণীয় মহামিলন সংঘটিত হইয়াছে।

ওঁ মধু! ওঁ মধু!! ওঁ মধু!!!

নিগৃহিতার কাহিনী

(কমলাবালা দেবী লিখিত আত্ম-চরিত)

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী প্রণীত

অবিশ্বাসী ও স্বার্থসর্ব্বস্ব পুরুষ যে কোমলহৃদয়া নারীকে সমাজের অত্যুচ্চ স্তর হইতে বিচ্যুত করিয়া শোচনীয় অধঃপতনের পথে নামাইয়া দিয়া তাহাকে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মাতুল হইয়া ভাগিনীকে বিবাহের নামে বলি দিয়া আবার তাহারই পাপপথে উপার্জ্জিত অর্থে আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, যাহার মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী শ্রবণে একদিন সমগ্র বাঙ্গালী স্তম্ভিত ও বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই নিগৃহীতা নির্য্যাতীতা কমলাবালার নিজমুখে তাহার জীবনের গূঢ়রহস্য-গুলি অবগত হৌন, আরও অবগত হৌন সেই হতভাগিনী ভদ্র-নারীদের নিপীড়িত জীবনের হৃদয় বিদারক কাহিনী, কমলাবালারই মত যাহারা পুরুষের বাসনার যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া রাখুন, যেই সকল উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, প্রফেসর, হাকিম-জমীদার, ব্যবসায়ী ও গৃহশিক্ষকের কীর্ত্তিকলাপ—কমলাবালা এবং তাহার বান্ধবীগণ নানা কারণে যাহাদের সংস্রবে আসিয়াছে কিংবা আসিতে বাধ্য হইয়াছে। আরও জানিয়া রাখুন যেই সকল নারী আশ্রম, হাসপাতাল, ধাত্রী-নিবাস, ফিল্ম, ষ্টুডিও, ভদ্রনারী নৃত্যের আস্তানা—রক্ষক খুঁজিতে গিয়া এই হতভাগিনীরা ভক্ষকই শুধু আবিষ্কার করিয়াছে। গ্রন্থবর্ণিত চরিত্রগুলি সকলই জীবন্ত, ঘটনাগুলি আগুন্ত সত্য—কোথাও একবর্ণ অতিরঞ্জিত নহে।

গ্রন্থকর্ত্রীর নিজের এবং অন্যান্য নিগৃহীতা, সমাজ ও সংসার বিচ্যুতা চৌদ্দটী ভদ্রমহিলার ফটো চিত্রসহ বিরাট গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধাই—দাম দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—এম, এল, দে এণ্ড কোং ৬৬, ৬৭, কলেজষ্ট্রীট্